# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

---

Jayanti Press : Calcutta.

1902.

মূল্য ২৲ টাকা

272

# সংগ্রহকারের নিবেদন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহাশয় যে প্রণালীতে তাঁহার এই গীতাব্যাখ্যা প্রণয়ন করিতেছিলেন, সেইরূপে ইহা সম্পূর্ণ হইলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের যে মহোপকার সাধিত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই, তিনি পুণ্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্তার জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদিত "প্রচারে" এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটুকু তখন অনেকেই দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রচারে এই ব্যাখ্যা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না, জানিতে চাহেন; এবং সম্পূর্ণ হয় নাই শুনিয়াও, স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অনেক পাঠক ঐ অসম্পূর্ণ অংশটুকুই পাইবার অভিলাষ করেন। তাঁহাদের আগ্রহ-পরিতৃপ্তির জন্য, প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।

ব্যাখ্যা দ্বারা গীতার উদার নীতি ও মাহাত্ম্য সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মূল গ্রন্থের যে সকল স্থান যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছিলেন, অন্য কাহারও সেই সকল স্থান ঠিক সেইরূপ বুঝা সম্ভবপর নয়; সুতরাং তিনি যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই চলিত। কিন্তু গীতার ন্যায় একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ হিন্দুমাত্রেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং রাখার প্রয়োজনও আছে।

এজন্য অবশিষ্ট মূলও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত অনুবাদ সহ ইহাতে নিবেশিত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক মহোদয় কর্ত্তৃক গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। তাহা হইলেও, উহাই এই গ্রন্থের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত গীতার অনুবাদের যে অংশটুকু ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় সেটুকু আমাদিগকে এই পুস্তকে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন, এ নিমিত্ত আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহোদয়ের একান্ত স্নেহপাত্র "সাহিত্য"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এই অনুমতি প্রাপ্তির বিষয়ে যত্ন করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকের প্রুফগুলি দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য ইঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞ আছি। ইতি।

কলিকাতা, ২৪শে ভাদ্র, ১৩০৯।

সংগ্রহকার,
শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সূচীপত্র।

# ভূমিকা।

---

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন, যে সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এইজন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজ কৃত অনুবাদে, কখন শঙ্কর-ভাষ্যের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজ কৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীতা টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইহাঁদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন;

বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দীপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে "গীতাসন্দীপনীতে" গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকিতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত"-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগকেই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন, যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যতদূর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন, বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যতদূর পারিয়াছি, পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা,

রামানুজভাষ্য, মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক্, এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কলিকাতা।<br>১২৯৩ সাল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ।
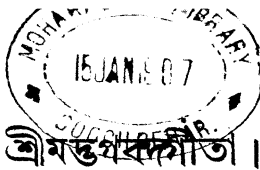
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্ব্বের ৩য় অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া এই পণে

আবদ্ধ হয়েন, যে দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তারপর, পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয়পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা-নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয় তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। বরপ্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর

দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে, উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্ম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটী চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেকবার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। "ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরসা করি কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এই জন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিকে কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন, পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, যে তাঁহার তপস্যার কারণই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো মখোবিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রে-বাশ্বিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।" অর্থাৎ দেবতারা এই খানে যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন, এজন্য ইহাকে 'দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান' বলে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—"উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী।" (৮৩ অধ্যায়) মনু-সংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ২। ১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রঘনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।

রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥

মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্যপ্রকার আছে। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়াছেন। *

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথিকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্যুক্ষেত্র' বা 'অমিন' বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করেন। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল; এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে। যেখানে সাত্যকিতেও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে "ভোর" বলে। জনপ্রবাদ আছে যে ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়।

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, "*Le champ du bonheur,*' অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র।

সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে "কুলুক্ষেত্র হইতেছে।" অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টমসন্, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাঁধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল। *

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

---

* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণ স্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্‌সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is often identified with Hastinapur, the capital of Kurukshetra."

এই টুকুর ভিতর ৫টী ভুল। (১) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) "The flat plain around Dehli কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২।

দুর্য্যোধনাদির অস্ত্রবিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য সন্নিবেশকে ব্যূহ বলে।

> সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
> স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যূহরচনাই প্রধান কার্য্য।

> পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
> ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইঁহার পিতা দ্রোণবধ-কামনায় যজ্ঞ করিলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে

স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শি
দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্ম বিদ্যা দান।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজা চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪, ৫, ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি। (২) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়)।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃষ্বস্থ-পুত্র। পাণ্ডবমাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম!।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বত্থামা (৭), বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯)। ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য্য।

(৭) দ্রোণপুত্র।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা।

(৯) দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবন ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৯ ॥

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে।

সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি॥ ১১ ॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনাদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খ-ধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥

তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল ( বাদ্যযন্ত্র সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪॥

তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্ম ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পব ( নামে ) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮।

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রা

১০ সেঃ ইহ

পুত্র,—হে পৃথিবীপতে!—ইহাঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজ'ইলেন। ১৭। ১৮।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥ *

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০॥

পরে হে মহীমতে! † ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০।

"ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।"

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যএতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

---

* তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

† বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

অর্জ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ( যাবৎ তাহা দেখি ), যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এই খানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১।২২।২৩।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত* ! অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর।২৪।২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

* ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহাঁরা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয়সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ * এবং সুহৃদ্‌গণকে দেখিলেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।†
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

* সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে সেই সখা।

† দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্। ইতি পাঠান্তর আছে।

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি।৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্য সুখ চাহি না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ, কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা, এবং কুটুম্বগণ, যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২।৩৩।৩৪।

"আমি হত হই হইব (ঘ্নতোপি)" কথার তাৎপর্য্য এই যে "আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন। অর্জ্জুনের "মৃদুযুদ্ধের" কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন ?। ৩৫।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। *
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ?। ৩৬।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

যে ঘরে আগুণ দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয়জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা অর্জ্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন, যে যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য।

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, সুতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality"র মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক্ সেইরূপ। "Law"র উপর "Morals"। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন এমনও বুঝাইতে পারে যে গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? ।৩৭।৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বার্ষ্ণেয়! * বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদকক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২॥

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩॥

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে যে মানুষদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটী শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কাণে ভাল লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বার্ষ্ণেয়।

প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডো-দকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতা-কারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি এতটুকু স্বীকার করিবেন। * বাকীটুকু

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil ; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other.

(*Thomson's Translation of the Bhagavadgita P. 7*).

* By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not

কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার। † কথাটা অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্মের" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ "স্বধর্ম্মের" কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ" এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

---

allowed to perform them ; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu x. 1-40). Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that "omnia divina humanaque turbari, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit"

(*Davies' Translation of the Bhagavadgita p. 26*).

† In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of belief—himself received and approved of them.

(*Thomson p. 7*).

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থউপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্জ্জুনবিষাদো *
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।"

* কোন কোন পুস্তকে "সৈন্যদর্শনং" ইতি পাঠ আছে।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উত্তমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরব-জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—"একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, "এই দেখ।" অর্জ্জুন দেখিলেন দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, "কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।" এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্য-জগতে দুর্লভ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন।

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন)-কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ।২।

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। ৩।

---

* "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" ইতি আনন্দগিরি-ধৃত পাঠ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব? ৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয় সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায় তাহা রুধিরলিপ্ত। ৫।

ন চৈতদ্বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭॥

কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয় আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও। ৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথাঃ— "মহদ্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।" আনন্দগিরি বলেন "যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না সেই কৃপণ।* শ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে "এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব?" অর্জ্জুনের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য। তিনি "কার্পণ্য-দোষ" ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ

* কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং "কার্পণ্য" শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন helplessness."

বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

---

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধম্
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥৯॥

সঞ্জয় বলিতেছেন,

শত্রুজয়ী অর্জ্জুন * হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০॥

---

* মূলে "গুড়াকেশ" শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জ্জুনের একটী নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন 'নিদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্য্যোধনাদি অন্যায় পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য?

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উলিয়ম দি সাইলেণ্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা

পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটী যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায় পূর্ব্বক, তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার

* এবং নবজীবন প্রথম খণ্ড দেখ।

করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্‌টা তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন, যে যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয়, যে যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে

হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। একথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু, গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন, যে এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টী কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি?

আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য।

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্ব্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন, যে "ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল," সেটা তাঁহার পরধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেননা ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।*

* শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃত্তে।—শাঙ্করভাষ্য।

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোক-সংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারত-বাসীর জন্য ধর্ম্ম বিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টানের* তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি "স্বধর্ম্মের" অন্য তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন † আছে। এই শরীরই বা কি? এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি

---

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

† "মন" চলিত কথা, এইজন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটী ইংরেজী "mind" শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটী শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে "matter and mind" এই বিভাগের অনুবর্ত্তী হওয়াই ভাল।

জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এই গুলির নাম দিয়াছি—"শারীরিকী বৃত্তি"। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেই গুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তি গুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। *

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল

* কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Thought, Feeling, Action," ইহা স্থায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এইজন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম স্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাহাদিগের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে, ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষিধর্ম্মী; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী; এবং যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, একথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী, বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয়, যে তদ্ধর্ম্মিগণ

আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোক শিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটী জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই যে এরূপ তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে*। এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া

* কেবল কাল সহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। "বাঙ্গালির উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, যে অনার্য্য জাতিবিশেষ-সকল হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্র জাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

কৃষিধর্ম্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধর্ম্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্ম্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল, যে মনুষ্যমাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা, এই যে এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম। * এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার Duty. তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্ কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি,—গীতাই হোক, Bibleই হোক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক, বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা, এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়।

* যথা চৌর্য্যাদি।

তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম্ম নিত্য; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটী বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্ত্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্ম্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেননা উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা যদি, যাহা হৌক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন কেন করিব তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক এ তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটী জ্ঞানমার্গ, আর একটী কর্ম্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞান-মার্গ কীর্ত্তন, তৎপরে কর্ম্ম-মার্গ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর। পর শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

**ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।**
**ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২॥**

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ।" যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, "দেখ, কেহ মরে না। দেখ আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা—হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের, ইস্‌লামধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্ম্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

আজ কাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম একদিকে, তাঁহারা আর একদিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হটিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন, বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্ত্তব্য যে আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কিরূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, "অহম্প্রত্যয়বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ"—অর্থাৎ "আমি" বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

"আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রচলিত প্রথানুসারে Science কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

একটী মনুষ্যদেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব ?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখ ভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা সেই আত্মা।" *

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক, এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টিয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্তত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দু-ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটী অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

---

* প্রবন্ধ পুস্তক।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর বহুসংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকলপাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যতদিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয় ততদিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাণ্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দুধর্ম্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, "আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে

প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহাহইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।" * বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর একজন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune does not die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact, those moderns who dispute the evidences of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling,

* যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা সে বিলাতী Pantheism নয়, এ কথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance." *

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

"In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we connot do."

পুনশ্চ—

"There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible ; and in like

* Three Essays on Religion, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity ; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or inferribe as possible.... ..Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it ; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment, and, we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditiens in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be

embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance."

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে প্রমাণ কি? যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটী দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে পুষ্পটী আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের*

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ব্ব-কৃত প্রত্যক্ষ হইতে, অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ গর্জ্জন ধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও বলেন, যে যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই, যে তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। *

* তবে সর্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যতদূর সাধ্য, বিজ্ঞান ততদূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের ততদূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি ততদূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক

আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্তাত্মা এই রূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অবস্থা বিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে, এই প্রেত-তত্ত্বই বিজ্ঞানের একটী শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানাপ্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind.** For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prison and the polariscope of science ever now triumphs for our pride and delight †" যখন বিজ্ঞান একটী ধূলি-কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, ‡ তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছ, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন, যে বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই।

* আত্মা।

† Oriental Religions, India, P. 447.

‡ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটী প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক-দিগের উত্তর, একটী আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটী জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কথনই মনুষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটী পৃথক প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেকস্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রম জ্ঞান জন্মে। যেথানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেথানে উহা পৃথগ্‌বিধ প্রমাণ নহে, অনুমান বিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শাব্দ" কি তাহা বুঝাইতেছি।

আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া

উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দরূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation. বস্তুতঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জর্ম্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক-দিগের মত এই যে প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন", ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয় স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে যাহাকে

আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই "Transcendental Philosophy," সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে **চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হইলে, আত্ম-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।** *

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর-ভক্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনিই পরমাত্মা, এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে।

---

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হয় নাই? উত্তর—না। সকলগুলি হয় নাই।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না॥ ১৩॥

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তর-প্রাপ্তি অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে;—যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তর-প্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব?

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না থাক্, যাহার প্রমাণাভাব তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তি-সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তর-বাদীর অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তর-বাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসবান্—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার কি গতি হয়?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতি-দিগের বিশ্বাস।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান-দিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয়, বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে শেষোক্ত এই তিনটী মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটী মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন, যে দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন, যে যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই

সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটী আমাদিগকে বড় যত্ন-পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় গুরুতর,—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া ইহার আলোচনা কালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন! গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country:" টেলর সাহেব ইহাকে "one of the most remarkable developments of ethical speculation" বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বলা হইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে তাহা বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটী শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্বাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সিসৃক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত

* Primitive Culture, Vol. I. p. 12.

হইয়া পৃথক্ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগ্‌ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে, যে জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মত ভেদ আছে। কেহ বলেন জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন কর্ম্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোনটী সত্য, বা কোনটী অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন, এই গুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে, যে দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক কর্ম্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ কালের জন্য যায়, বা অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে, জীব কর্ম্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে, নয়, বল যে, অনন্ত কাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সৎকর্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃতপাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাশ হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি ঊর্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটীর উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না, কেন না, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্ম্ম ক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্ম্মের অভাব। অতএব

এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্ম্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহ-ধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্ম্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্ম্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাশ হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ, যে অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও,

তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, যে তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি ?”

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিয়ে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী ; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণ রূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে ; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার এক মাত্র পুত্র ;—জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন ? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্মফল নহে, কেন না সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন,—“সকলই কি কর্ম্মফল ? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব, মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে এমন কোন কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে।

অতএব মৃত্যু কর্ম্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি কর্ম্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্ম্মফল বলিব কেন? যাহা কর্ম্মফল আর যাহা কর্ম্মফল নহে সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতী-সংসর্গে অবস্থা বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাতব্যক্তির কর্ম্মফল খুঁজিব কেন?"

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ব্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, "ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি, যে এবিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্ঞীর গর্ব্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ব্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল, যে এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্ত্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্য টুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে, যে, যে টুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্য টুকু,

বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি, যে মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতি এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য মধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে, তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে, যে গর্ভাধান কালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যতদিন শিশু গর্ভে থাকে, ততদিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি?"

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, যে এই সকল তারতম্য এতদূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকি টুকু মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও বিজ্ঞান এতদূর যায় নাই, যে এই তারতম্যের কারণ সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না,

তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বসে করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্।*

* "It has been accepted, in some form, by disciples of every Great religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins, and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of North America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Primo, Herder, Sir Thomas

বলা বাহুল্য যে এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্ত্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Phœdon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা বলা বাহুল্য। * আর যদি কোন সিদ্ধ

---

Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." Oriental Religions ; India p. 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর প্রণীত "Primitive culture" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

পুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন, যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেননা দুইটী সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিতে বিশ্বাসবান্ না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয়, যে পূর্ব্বে যেন কখনও এস্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয়, যে এজন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন, যে

---

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbas whom Menelaus slew at the seige of Troy. Afterwards he was Hermotunos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul entered the body of a cock. Mikyllos asks the cock to tell him of the siege of Troy—were things there really as Homer has said? But the cock replies;—"How should Homer have known, O Mikyllos, when the Trojan war ws going on, he was a camel in Bactria."—*Tylor's Primitive Culture, Vol II,* p. 13.

বলা বাহুল্য ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

পূর্ব্বজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়?

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন, যে তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে এ সকল "Fallacies of Memory" অথবা মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের Mental Physiology নামক গ্রন্থ হইতে দুইটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went over with a party of friends to Pevensey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction that he *must* have visited the castle on some former occasion—although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once

informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen months* old, she had gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ব্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটী উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests, to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her

ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew saying only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question; the woman was a simple creature; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু এই স্ত্রীলোকের "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, যে এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্ত্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যতদিন না হয়, ততদিন এ প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ব্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না যে মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না এই সকল স্মৃতি যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে, যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না পরমাত্মায় যাহা লীন তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব

নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন, যে আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীব-জন্মে একটী নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেন না বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল সূত্র এই, যে জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটী নিয়ম এই যে জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,— নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান জড় পদার্থ সমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা যাহা শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ।

* নাবস্তুনাবস্তু-সিদ্ধিঃ *Exnihilo nihil fit.*

অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন শুনা যাউক। *

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

"The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Buddhist form, is not capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe. † The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be dispro-

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন **Fourier**, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, **Pezzani** প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

† Buddhisim—p. 100.

ved, * for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

টৈলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Buddhist Theory of "Karma," or "Action," which controls the destiny of all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." *Primitve Culture—Vol II.* p. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খৃষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টৈলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে,

* যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে দেহভ্রষ্ট মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের নিরাস হয় না। জন্মান্তরবাদীরা এমন বলেন না, যে সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে কখন কখন দেহান্তর প্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না।

কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেই গুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে তিনি বিচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতে-ছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটী ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য—অর্থাৎ miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্ম কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নিবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—"miracle" প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খৃষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pil-grimage before he can regain the source of all perfec-tion;—the firm conviction and positive certainty

that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself.' *

পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ।

"The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural

* Philosophy of History—translated by Robertson—Bohn's Edition—p. 157-8.

and profound aspirations. It combined the two-fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth. *"

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাঁহারা, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না, কেন না জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটীতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাসমাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয়, যে ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হয়েন তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না ?

* Oriental Religions, India p 539.

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে না করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কেন না চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাংস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪।

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ, * ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর॥ ১৪॥

একাদশ শ্লোকে বলা হইল, যে যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না, কেননা আত্মা অবিনাশী। তুমি

* মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

কাটিয়া পাড়িলেও সে থাকিবে, কেন না তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি সে আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, যে এ রূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত, কেন না যেমন কৌমার যৌবন জরা একব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতেও অর্জ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে. দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন, যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীত স্বরূপ যে দুঃখ তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস-গুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। দুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখসহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেননা তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য "শীতোষ্ণ সুখদুঃখ" একত্র গণনা করা হইয়াছে। *

---

* এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ আছে, ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে; তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "মীয়ন্তে আভির্ম্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদিনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।" শ্রীধরস্বামীও ঐরূপ বলেন যথা "মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।" মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক্ তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।" তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক Davis স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে matter, সুতরাং তিনি "মাত্রাস্পর্শাঃ" পদের অনুবাদে "matter-contacts" লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের "তন্মাত্র" শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

**যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।**
**সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥**

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এ জন্য জন্মান্তরও দুঃখ, কেননা পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন "ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেননা, যে দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহ জীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।**
**উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥**

**অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শি-গণ এইরূপ উভয়ের অন্তদর্শন করিয়াছেন।**

**অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে তাহাই**

সৎ ; যাহা নাই বা থাকিবে না তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেননা সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।" আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্‌বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন দিক্ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন দিক্ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ। নিম্নে তাহার একটী অনুবাদ দেওয়া গেল।

"কারণ হইতে উৎপন্ন অতএব অসৎস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয় ; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় ( অর্থাৎ কখন বিকার থাকে কখন থাকে না )। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না ; সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার বিকার-পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই অসৎ হইয়া পড়ে, ( সৎ আর কিছুই থাকে না )। এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার "আছে" বলিয়া বোধ হইলে আর "নাই" বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র, এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন "নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন ভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন "ঘটঃ সন্" "পটঃ সন্" "হস্তী সন্" ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত "সৎ" এই জ্ঞান অভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদ-বুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের ( সৎ ও অসৎ ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা প্রদর্শিত

হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

যদি বল ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তি-কারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির ব্যভি-চার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক)। এই আপত্তি খাটিতে পারে না, কারণ তৎকালে সেই সৎবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্ত্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না)। সে সৎবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্য নাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল সৎবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটী ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, "সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক," এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল সৎবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। যদি বল ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সৎবুদ্ধি এবং উদক উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে 'সৎ ইদং উদকং' এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে)।

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই। এবং সৎ যে আত্মা তাঁহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ সে সৎই, যে অসৎ সে অসৎই।*"

শঙ্করাচার্য্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে, সহ্য করিতে পারিলেই, দুঃখ নষ্ট হইবে।

"——————The darkest day,
Wait till to-morrow, will have passed away."

এখন, ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটী আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জ্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ-নিবারণ হইল; দুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখনিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া

* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে ?

না। তাহা নহে। দুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়, সেখানে দুঃখনিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম পরিত্যাগে অধর্ম্ম। অতএব এস্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, দুঃখই সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ ? সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিব ? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা, যে পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না ? তবে আর aceticism কাহাকে বলে ? সুখশূন্য ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে ?

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ তাহা দুঃখের কারণ—তাহা দুঃখ মধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্ম্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিয়াছি যে দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব—জন্মান্তরবাদ। এই চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখদুঃখের অনাত্মধর্ম্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক; শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গ-বিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সূত্র।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র।) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপ-রজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থ্য-পাটলিপুত্রস্থ্য-য়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধান-বিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান। তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশ ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প

এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অত-এব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ( ৬,৭।)*

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না।

"যাহার দ্বারা" অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। এই "সকলই" অর্থাৎ জগৎ। এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত।

যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্ত্বা সর্ব্বব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী

* প্রবন্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাধন করিতে পারে না।

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর কয়েকটী কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ, এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, যে ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্ব্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা

যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে "নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে।

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি, এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহার নাম "অনন্ত," তিনি "সর্ব্বব্যাপী"। যিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না। এবং তিনি যে নির্গুণ ও নিরাকার তাহা পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে।

ইত্যাদি। ১।১৯।৭৯

পুনশ্চ, বিষ্ণু "অনাদিমধ্যান্তঃ" সুতরাং নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহা নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্ম্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চ্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্ম্মে সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্যদেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চ্চনা সাকারের উপাসনা নয়। এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চ্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না, যে এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের

প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড, ঈশ্বর নহে, বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে এ মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্ব্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যেরূপে কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ, কেন না ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা "আমাদের" অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমা পূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমা পূজা অবশ্য "আমাদের" নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে এই প্রতিমা পূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমরাও তাহাই

বিশ্বাস করিতে বাধ্য ; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীস্ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমা পূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলেন যে ভারতবর্ষ প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে ; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য ; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয় যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য ; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না ; আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে ; এবং

এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়।

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথারও বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না এমন যদি কেহ থাকেন, যে তিনি আপনার সান্তচিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে, বিচার বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমি "সাকারের উপাসনা," এবং "সাকারোপাসক" ভিন্ন "সাকারবাদ" বা "সাকারবাদী" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, "সাকারবাদ" অবশ্য পরিহার্য্য। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

কথাটা উঠিতে পারে যে ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দু-ধর্ম্মের অবতারবাদের কি হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছানুসারে তিনি

যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার সীমা নির্দ্দেশ করা হয়।

"যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, যে বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই। স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা যাইবে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮।

নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপে স্থিত। (শ্রীধর)

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য। প্রত্যক্ষাদির অতীত।

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাঁহার এই দেহ সুখদুঃখাদিধর্ম্মক, ইহা তত্ত্বদর্শীদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। তিনি বলেন—"ইহাতে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবদ্ধ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে আছেন,

ভগবান্ তাঁহার কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন মাত্র। অতএব 'যুদ্ধ কর' ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।"

অনেকের বিশ্বাস, যে এই গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য—যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাঁহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা, বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে যে একবার পড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—স্বধর্ম্ম-পালনের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করা। স্বধর্ম্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ—Duty—শুনিলে বোধ হয় সে কষ্ট থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—সেই Duty ধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন করা। সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম এক প্রকার নহে—কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধর্ম্ম ক্ষমা। শিপাহির স্বধর্ম্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ম্ম মধ্যে যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। এমন অবস্থা ঘটে, যে এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য ও স্বধর্ম্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা

বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না।২০।

টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়্ভাব-বিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য—এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্ত্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্ত্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ সদ্রূপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা তাহা ইঁহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন না। সেইজন্য ইনি, অজ, অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ; শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটী শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ "নায়ং হন্তি" এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটী মত। তত্ত্বটা কি, তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুইটী শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুইটী কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটী ১৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের যেটী ২০শ

শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ২।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২।২০
গীতা।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২।১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২।১৮
কঠোপনিষদ্।

শ্লোক দুইটী কঠোপনিষদ্ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে—গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশি বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ্ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শোক-মোহাদি সংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়" এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং ইত্যাদ্যামৃচমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য-এনমিতি।"

এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।
প্রথম, আত্মা যদি কর্ত্তা নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া

দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মযোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটী সপ্রমাণ করিয়া কোম্‌ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত—আত্মাই কর্ত্তা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটী কথা তুলিব। একটী উপনিষদ্ হইতে, আর একটী পুরাণ হইতে।

> আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
> নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
> স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। ১
> স ইমাল্লোঁকান্ সৃজত অম্ভো মরীচীর্ম্মরমিত্যাদি
> ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা—

কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ সাধু সমাচরন্॥
বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮।২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥২১॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়? ।২১।

ভাবার্থ—যে জানে যে দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে, যে সে "আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম" বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে "ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীর নাশেরই বা আমি কেন কারণ হই?" তাহার উত্তর, পরশ্লোকে কথিত হইতেছে——

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র *

* "It was if my soul were thinking separately from the body; she looked upon the *body as a foreign*

গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়।২২।

অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক্ বা না দিক্, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না?

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোক-মোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযুজ্য। নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে, যে কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য ধর্ম্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর—কারণ নাই, কেন না আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র—তাহাতে কাঁদাকাটার কথাটা কি?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

---

*substance, as we look upon a garment.*" ***Wilhelm Meister***, Carlyle's *Translation*. Book VI.

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে।

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য, বলিয়া কথিত হন। ২৪।

স্থাণু, অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাদি, এজন্য আত্মা নিত্য; নিত্য এজন্য সর্ব্বগত, সর্ব্বগত এজন্য স্থিরস্বভাব, স্থিরস্বভাব এজন্য অচল; অচল এজন্য সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

---

* "নৈবং" পাঠান্তর।

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে *সর্ব্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না।* ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। পরশ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর, আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, যে আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে, অতএব যাহা অপরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলা আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

*জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে শোকবিলাপ কি ?। ২৮।*

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, "অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধির্যেষাং ভূতানাং" অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর অর্থ করেন, "অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপম্।" অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়।

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল, আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? "প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বিব শোকো ন যুজ্যতে" (আনন্দগিরি)— ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের জন্য শোক অনুচিত।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্বল্যমান।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই (আত্মা) কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই, যে তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্ঞেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে, যে "আত্মা অবিনাশী," এবং "ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়" এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্ব্বোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও, কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্ব্বদা-জাজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্ব্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০।

আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর নাই। ২১।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা সর্ব্বস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধৃগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহাদের আজ্ঞা-মত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধৃমাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্ম্ম যুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীষ্মের ন্যায় পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ব-বশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্য মধ্যে খুঁজিলে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজন-

রক্ষা, সমাজ রক্ষা, দেশ রক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্ম পালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। অর্জ্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম্ম—অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অর্জ্জুন সেই অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্ বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে কেহ মরিবে না—কেন না দেহী অমর। যাইবে কেবল শূন্যদেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্মে উপেক্ষা অকর্ত্তব্য। এই ধর্ম্মযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে। ৩৩।

৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকেব তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ৩৪।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। তারপর অধিক দুঃখ আর কি আছে? ।৩৬।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব, হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭।

৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭, এই চারিটী শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই চারিটী শ্লোক গীতার অযোগ্য।

গীতায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই শ্লোকের বিষয় না ধর্ম্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটী শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, যে লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। সত্য বটে আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম্ম এতই দুর্ব্বল, যে অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর, চৌর্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোকনিন্দা ভয়ে চুরি করে না; অনেক পার-দারিক লোকনিন্দা ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম্ম হইল না; পিতলকে গিল্টি করিলে দুই চারিদিন সোণা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোণা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রূণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত—তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-

নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ লোক নির্ব্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, মনুষ্যের ধর্ম্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোকনিন্দা ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোক-নিন্দাভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অর্জ্জুনকে সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেন না গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্ম্মে সুদীক্ষিত; এরূপ পাপোক্তি তাঁহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন, যে এই শ্লোক চারিটী প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে, যে ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই কয় শ্লোককে "লৌকিক ন্যায়" বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি "লৌকিক ন্যায়" পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর, ও পৃথিবীভোগের কথার পরেই "এষা-তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে" ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যাঁহারা এই চারিটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে, যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা

রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অতএব, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮।

যুদ্ধই যদি স্বধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেননা ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ৪৮।

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ!

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তদ্দ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে।

প্রথম—সাংখ্য কি? "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামটী এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ "তত্ত্বজ্ঞান" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, * এক্ষণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে, "কর্ম্মযোগ" "ভক্তিযোগ" ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ গীতায় "যোগ" শব্দটী সর্ব্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধন বিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটী উপায় বা সাধন, কর্ম্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে "যোগ" অর্থে কর্ম্মযোগ। এই অর্থে "যোগ" "যোগী" "যুক্ত"

* যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে "যোগ" শব্দে জ্ঞান-যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটী শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম্ম। এক্ষণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে; তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে; Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই "সাংখ্যযোগ"। * জ্ঞানে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক † হইতে কর্ম্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া, "যদি অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া

* চতুর্থাধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। প্রভেদ কি পশ্চাৎ জানা যাইবে।

† মধ্যের চারিটী শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না?

থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই "কর্ম্মযোগ" কহিতেছেন ( হিতলাল মিশ্র )। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৬।৩

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে
ইত্যাদি। ৫।৬।৫

এ সকল কথার মর্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল "কর্ম্মবন্ধ" হইতে মোচন। কর্ম্মবন্ধ কি? কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে ইহজন্মেই আমরা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দ্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই আমাদের

প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই "বড়মানুষী," করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্ম্মের ফল, ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্ম্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, এক গুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দ্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজ-দণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কর্ম্মফলভোগ নাই, এমত নহে। এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি, * পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি, যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে, যে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাও দেখিব। সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য যে আর এক কর্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্ম্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০॥

**এই (কর্ম্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের অল্পতেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।**

জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্পজ্ঞানের

কোন ফলোপধায়িতা নাই ; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ—সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্‌॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন! ইহাতে (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে।

শ্রীধর বলেন, "পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব," এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহির্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্ম্মফলগুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়।

কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য এই। ভগবান্ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্তু অর্জ্জুন সহসা মনে করিতে পারেন, যে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ, কেন না তৎকালে বৈদিক কাম্যকর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতেছেন যে কাম্য-

কর্ম্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী। কর্ম্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলি-বেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত "(তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই" যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত; তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না।

এই তিনটী শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; কেন না, এই ছয়টী শ্লোকে একটী বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি। *

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ সংস্কৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটী অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদক কৃত অনুবাদও এস্থলে দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে, যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক।

কাম্যকর্ম্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে; কেন না বলা হইয়া থাকে, যে এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি।

সেই সকল কথা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, "জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা।" জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন; "জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।" জন্ম, তথা কর্ম্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তার পর ঐ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে "ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল" বলা হইয়াছে। ইহা বুঝিবার কোন

---

"যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকবিহীন মূঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয় শূন্য হয় না।"

কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ।

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা "বেদবাদরত।" বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকর্ম্মানুরাগী তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া "আর কিছু নাই" ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা "কামাত্মা" বা কামনাপরবশ—"স্বর্গপর," অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত—সেই জন্যই স্বর্গকামনা করে, কেন না স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে, এবম্বিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে সেই সকল বহুপ্রকার কাম্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া

আর ধর্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না তাহাদের বুদ্ধি "বহুশাখা" ও "অনন্তা" ইহা পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ, এই উনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীনকালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্য-প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য!

ইহার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিককর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা বলে বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত, ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিতে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য, যে যাঁহারা বলেন, যে বেদে যাহা আছে তাহাই ধর্ম্ম,

তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম্ম আছে ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে—যথা এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন, যে যেমন একদিকে, বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা ধর্ম্ম নহে, আবার অপরদিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদারণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যস্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্ব্ব হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥ ৫৬
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং॥ ৫৭ *

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক, এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা, যে এতদ্দ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।

ততদূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদ-নিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি,

* "অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কর্ণপর্ব্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে এই শ্লোক দুটী ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্যত্র ৬৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

তাহা মৎপ্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে।

কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপ ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন।

তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। একদল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম কাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম। অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পর-মাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞান-বাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সক-লের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।"

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, অনন্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, যে জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অন্য

পথও আছে; অধিকারীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং অন্যমার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টী কথা লইয়া গীতা।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও। ৪৫ ॥

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, "ত্রৈগুণ্যবিষয়" কি? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (Subject) তাহাই "ত্রৈগুণ্যবিষয়।" সংসারই বেদের বিষয়, এইজন্য বেদ সকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়।"

শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং-তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ।" ইহাও একটু বেদনিন্দার মত শুনায়। অতএব, শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্রৌব্যান্ন বিবেকাবসরোঽস্তীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ "এখানে বেদ শব্দের অর্থ কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান

দ্বারা সংসারশ্রৌব্য হেতু বিবেকের অবসন্ন থাকে না।" বেদের কতটুকু কর্ম্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীধর স্বামী বলেন, "ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্ত-দ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ"। এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে "ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই (!) বেদ সকল কর্ম্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।" এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে—"বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক।" অন্যান্যেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

উভয় ব্যাখ্যা মর্ম্মতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে "হে অর্জ্জুন! বেদ সকল সংসার-প্রতিপাদক বা কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্ম্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও।" কথাটা কি হইতেছিল স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্ম্মযোগ বুঝাইবেন অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না কর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্ত্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ম্ম কি, অর্জ্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই, যে বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-

প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান্ বুঝাইতে চাহেন যে ইহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্ত-নিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এজন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম্ম নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন, যে বেদ সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে তাহাদিগেরই অনুসরণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও। এখন এই কটা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়।

১। নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিকে দ্বন্দ্ব বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। যে সে সকল তুল্য জ্ঞান করে সেই নির্দ্বন্দ্ব।

২। নিত্যসত্ত্বস্থ—নিত্য স্বত্ত্বগুণাশ্রিত।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত—যাহা অপ্রাপ্ত তাহার উপার্জ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জ্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা তদ্রহিত হও।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত। *

---

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম। কিন্তু যাঁহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব।

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটী পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব।

---

"শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টী যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদ সমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ-তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।"

দ্বিতীয়। আর একটী নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :—

১ম। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ, বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই ; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলালমিশ্র-কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাহা হইতে জলপান করা যায় তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কূপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংপ্লুতোদক শব্দবাচ্য

এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্দ্বারাই সম্পন্ন হয়।"

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেক গুলিন পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্রদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেইরূপ, সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।"*

---

* শঙ্করাচার্য্য ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি। ইহার ভিতর অল্প যে কল কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। সম্প্রতি "সর্ব্বেষু বেদেষু" ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থ "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।" যে

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্ব্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও সম্ভাবনাও নাই।

'যাবৎ,' 'তাবৎ' শব্দ পরিমাণ বাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই, তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে, যে কেবল "যাবৎ" শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্ত্তী "তাবৎ"-কে বুঝিয়া লইতে হয়; যথা—"আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।" ইহার প্রকৃত অর্থ "আমি যাবৎ না আসি (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।" অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটী তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও" এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে "আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতি কাল, উভয়ে সমান হইবে।" এখানে এই দুইটী সময় তুল্য বা তুলনীয়।

---

কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে," সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।"

এইরূপ যেখানে একটী যাবান্ আর একটী তাবান্ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে দুইটী বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে আবার আরও দুইটী বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না।

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটী যাবান্ আর একটী তাবান্ আছে; অতএব বুঝিতে হইবে দুইটী বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে অর্থাৎ, (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে অবস্থা বিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন (২) সমস্ত বেদে অবস্থা বিশেষে তাবৎ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে **দুইটা যাবান্ এবং দুইটা তাবান্**। * অতএব বুঝিতে হইবে যে প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া, মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে কি না।

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর, যে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে

* বড় বড় অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

হয়; তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে ছুইটী আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি বলেন যে এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

"যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।" (ক)

এই বাক্যটী উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর, উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

"তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ।" (খ)

এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে "তুমি যতদিন বাঁচিবে, ততদিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না। (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ "যতদিন আমি সুখী থাকিব ততদিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর আর তুমি বাঁচিবে না।" অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য শ্লোকের চারিটী চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক্। তাহা হইলে শ্লোকস্থ "যাবানের" গায়ে (ক) এবং "তাবানের" গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে
(খ) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
(গ) তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
(ঘ) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে
(খ) তাবান্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
(গ) যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
(ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না। *

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজন মতে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া

---

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে "যদ্" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অর্থই আছে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি;—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, যে তাঁহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরবর্ত্তী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত—সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কূপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়ম্ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্য-সিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে ব্রহ্মজ্ঞানেও যা বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা বাহাল রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু" "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে।" ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক

এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি সেইরূপ বুঝাইলাম। দুই দিকই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে সম্বন্ধ কি, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি।

তৃতীয়; ইংরাজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ এরূপ না বুঝিয়া তাঁহারা বুঝেন সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ "সংপ্লুতোদকে" পদ "উদপানের" বিশেষণ মাত্র। অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a reservoir of water into which waters flow from all sides."

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের একটী টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন—

"The meaning here is not easily apprehended.

I suggest the following explanation :—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits. Krishna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy, &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one's clothes, and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who is well acquainted with them and knows how to wield them. We may examplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, be understood to reject the use

of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others fail."

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন, বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি, যে ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি। এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রবাদ আছে যে পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব একদিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ ঊর্ম্মি-মালার মত তাঁহারও মানস সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন—প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বেদোক্ত ধর্ম্মকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া

পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে বুঝি আমার কর্ত্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—অশান্ত মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব! কোথায় আমায় কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্ত্তব্য বাকি আছে, নির্দ্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। "ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর" এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই এক খানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন।

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন, যে এখন তোমাকে কর্ম্মযোগ শুনাইব। তখন কর্ম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে বেদসকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়" তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেননা, যেমন সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত

হইলে বাপী কূপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মযোগের সহিত বৈদিক কর্ম্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া, ভগবান্ এক্ষণে কর্ম্মযোগ কহিতেছেন ;—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ ( অধিকার ) না হউক। তুমি কর্ম্মফলহেতু হইও না ; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, "কর্ম্ম" কি, "কর্ম্মফলহেতু" কি, "অকর্ম্ম" কি বুঝা চাই।

"কর্ম্ম কি" কি, বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্ম্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই "কর্ম্মফলহেতু"। কর্ম্মশূন্যতাই, অকর্ম্ম। কর্ম্ম কি তাহা পরে বলিতেছি।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম করিও, কিন্তু, কর্ম্মফল কামনা করিও না। কর্ম্মফল প্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্ম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে, ফল চাহি না, বলিয়া কর্ম্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম্ম অবশ্য করিবে কিন্তু ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবে না।

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। এরূপ উন্নত পবিত্র এবং মনুষ্যের

মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধি-বিভ্রংশ বশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না, যে আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি, বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝাইতে পারিবেন। তবে যত টুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায়, বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম্ম, কর্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার, বা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ম্ম নহে—বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম্ম।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয়, যে বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে; কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজি নবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ ইহার পূর্ব্ব শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "The Vedas...pres-

cribe particular rites and ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

যদি কর্ম্মশব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোল-যোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিবেন যে, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কর্ম্ম কিরূপ? কাম্যকর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকর্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই "কর্ম্মযোগ"। ইহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। ৫

"কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে।"

এখন, দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলি—

যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল একথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, অন্য কোন কাজ না করুক স্বভাব বা প্রকৃতির ( Nature ) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা, অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস, ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্মশব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর ; কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; অকর্ম্মে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না"

এখানেও, নিশ্চিত কর্ম্ম শব্দ, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা "কাজ" ;— যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। * প্রমাণ নির্দ্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিষ্প্রয়োজনীয়।

* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব এমন কথা বলি না—পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার

অতএব ইহা সিদ্ধ, যে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম্ম অর্থে যাহা সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, অর্থাৎ কাজ, বা actión, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে।

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে, যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ইহার ভিতর দুইটী আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটী করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কর্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম—Law of Life—কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না—সকলেই প্রকৃতিজগুণে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

কিন্তু সকল কর্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি? অসৎকর্ম্মও করিতে হইবে?

---

করিতে আমি বাধ্য, যে কখন কখন গীতাতেও কর্ম্ম শব্দে বৈদিক কাম্য কর্ম্ম বুঝায়, যথা, এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম"। কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ "কর্ম্মের" সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধভাব। গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অসৎকর্ম্ম আমাদের জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসৎকর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে;—অসৎ কর্ম্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎ কর্ম্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, যে যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবন যাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলি, যথা পরোপকারাদি;—আর কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি;—আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে, যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি, করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলে নয় সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন? সৎকর্ম্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে?

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি, যে যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ, কর্ম্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই

দুইকে আমি ধর্ম্মতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম, এই গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, "কর্ম্ম করিবে," তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম্ম করিবে তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, যে আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে, যে ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কর্ম্ম, এবং তাহাও এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন, যে ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিষ্কামকর্ম্মী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব।

ধর্ম্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে এইটী প্রথম কথা। এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া ( কর্ম্ম কর )। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে।

পূর্ব্বশ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম করার পক্ষে, তিনটী বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে।

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে।

ক্রমশঃ এই তিনটী বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে

বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না, যে যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না।

এখানে "যোগ" শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামীর মতে "পরমেশ্বরৈক-পরতা।" শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্।" কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, "কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

স্থূলকথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, "কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ।" আমি কর্ত্তা এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্ত্তা, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা," কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে 'সঙ্গ' শব্দ পুনঃপুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্ম্মসিদ্ধি, এবং কর্ম্মের

অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা, জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন, যে "সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ।" এবং "তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিঃ।" শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি বলেন, "কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ" ইত্যাদি।

এখন জ্ঞান, কর্ম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদিগের পরম লাভ হইবে। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বেতি ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা।" ইত্যাদি। ফল-সিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ, এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফল-সিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না, এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যতদিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে সে ফলকামনা করে—কেন না ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষলাভ করিবে কেন। কর্ম্মচারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই, বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ম্ম শব্দে কাম্য কর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইতেছে, যে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর; বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান কর। ইহাতে এখানে "বুদ্ধি" শব্দে ঐ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দ্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।" ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ

করেন। তজ্জন্য, তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ॥ ৫০॥

"বুদ্ধিযুক্ত"—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত। যে সকল কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই সুকৃত। আর সে সকল কর্ম্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে, যে তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ এই যে তিনি স্বর্গাদি কামনা, বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম, বন্ধনজনক, কেন না কর্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মে কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল যথাবিহিত নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্ম্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে সেখানে ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়-দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্ত্তী হইব।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময়পদপ্রাপ্ত হয়েন।

"বুদ্ধিযুক্ত"—বুদ্ধিযোগাবলম্বী।

অনাময়পদ—সর্ব্বোপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ। (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২।

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবে।

এই ফল কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাময়পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনাশূন্যতা জন্মে। স্বর্গাদিসুখ, বা রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩।

তোমার "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না"। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত। * কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা শুনা গিয়াছে—আর শ্রুতি, বেদকে

* *Anglice*—distracted.

বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না ; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে "যাহা শুনা গিয়াছে," তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—শ্রুতি শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, "নানাবিধ ফলশ্রবণই" শ্রুতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মার্জ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশির ভাগ। তিনি বলেন "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশন-শ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।" শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, "নানালৌকিকবৈদিকার্থ-শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।"

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে পণ্ডিত মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন—

"I, too, have consulted Hindu Commentators largely ( কদাচিৎ ) and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the author. ( শাঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও একথা বলিয়া থাকেন )। I have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought and thus while I have sometimes followed their

guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author, I append some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgement."

এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন, যে—

"Here the reference is to *Sruti*, which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtaining desirable things; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (*yogin*), when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual."

ডেবিস একজন ক্ষুদ্রপ্রাণী—তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের—খোদ লাসেনের। তিনিও "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার পথে গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ডেবিসের আত্মশ্লাঘার ভিতর একটী অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে তদানীং ছিল না, ও এখনও নাই। "FREEDOM OF ENQUIRY"—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই

আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" ভিন্ন আর একটী মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই "সমাধি"।

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধীব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন? ।৫৪।

ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্ এক্ষণে অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন, যে কর্ম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যতদিন সেরূপ থাকিবে, ততদিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন

তোমার বুদ্ধি সমাধিতে ( পরমেশ্বরে ) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যখন সকলপ্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫।

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে "আত্মারাম" বলা হইয়াছে।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনি পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জ্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশূন্য হইলে বহির্ব্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না জনার্দ্দনে আনন্দ লাভ করে না? না সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না। এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই

সকল উক্তি এই শ্লোক, এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টী শ্লোক Ascetic Philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নির্ব্বিঘ্ন উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্ত্তী হইলে সাংসারিক সুখ সকলের উপভোগের আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে ( ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬।

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দুঃখনাশক ( সুতরাং ) সুখবৃদ্ধির উপায়। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী, কেন না সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না ; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল

প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ—ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার বলিতে হইবে না।

বলিতে কেবল বাকি আছে, যে সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখত্যাগ করা হইল না। এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগ-ত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য, সে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্য, অথচ অনন্তসুখে সুখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, মনুষ্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্ম্মযোগের মর্ম্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলই সুখ—যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, সে সুখ লাভ করে না—কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ম্মের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে—সুখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই, স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭।

"সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য।"—"শ্রীধর বলেন, সর্ব্বত্র কি না 'পুত্রমিত্রাদিষপি।' শঙ্কর বলেন, "দেহজীবিতাদিষপি।" শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না। ৫৭।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গ সকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোনপ্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই; ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান। * সর্ব্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কূর্ম্মের উপমার প্রতি একটু

* All ethical gymnastic consists therefore singly in the subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality; a gymnastic exercise rendering the will hardly and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad.—*Kant-Metaphysics of Ethics*—translated Semple.

মনোযোগ আবশ্যক। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্দ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

নিরাহার দেহীর ( ইন্দ্রিয়াদির ) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। ( কেবল ) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

"নিরাহার"—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত।

মনের একটী অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর একদিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জ্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। "পরং দৃষ্ট্বা" এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে, যে ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে।

ধর্ম্মের এই বিঘ্ন এমন গুরুতর যে ভগবান্ পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূর্ব্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলা হইতেছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাহাতে আসক্তি

জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩।

যাহাকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে* তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ।*

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া যাইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধর্ম্ম asceticism † না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়।

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগনিষিদ্ধ নহে; তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

---

* সীতারামের চরিত্রের বর্ত্তমান লেখক এই কথা গুলিন উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন।

† আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সংন্যাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিষ। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন।

বিধেয়াত্মা—যাঁহার আত্মা ও অন্তঃকরণ বশবর্ত্তী।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আজ্ঞাধীন—বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না; তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি * লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম, যে গীতোক্ত এই ধর্ম্ম Ascetic Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে "রাগদ্বেষ বিমুক্ত"—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগশূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য

* "Makes the heart glad."—পূর্ব্বোদ্ধৃত কান্তের উক্তি দেখ।

বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সেত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষেধ কেন।

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন না, চটিজুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই। যে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা যথার্থ স্থিত-প্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দার-পরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন। এবং সেই জন্য স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না।

Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম তাহারও বিরোধী। কেন না Puritanism এই "বিদ্বেষ"-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়।

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে, যে আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত, বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ নাই।

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা।

যাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন,

আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭।

টীকার প্রয়োজন নাই।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্ব প্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ।

টীকার প্রয়োজন নাই।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। "অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়-নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।"

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

যেমন পূর্য্যমান স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ সকলের কামনা করেন, তিনি পান না।

সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়তাড়িত সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কর্ম্মফলজনিত সুখলাভের কারণ। কর্ম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে; তাদৃশ সুখই শান্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শান্তি নাই; সুতরাং সে সুখ সুখই নয়।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

মমতাশূন্য—আত্মাভিমানশূন্য।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২।

তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনাপরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ইহা হইলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্ব্বাচন মাত্র। হিন্দুধর্ম্মে বা অপর কোন ধর্ম্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল। ইহা সকলের আয়ত্ত,

ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা গায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সাংখ্যযোগোনাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

# তৃতীয় অধ্যায়।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন!।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!॥ ১

হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?। ১

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জ্জুন এইরূপ বুঝিয়াছেন, যে জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে যদি জ্ঞানই কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম্মে বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে মোক্ষসাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্তু এতদুভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্ক্রিয়ত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" (৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংসা উপসংহারে, বুদ্ধি ও

কর্ম্ম এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই, যে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে ৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে,

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় !"

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কর্ম্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকায় "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকটী বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্ম্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, তাহা কিছু "ব্যামিশ্র" ( anglice ambiguous ) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই ভগবান্ কথা প্রথমে পরিস্ফুট করেন নাই—এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্তমঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় ধর্ম্ম কথিত হয় নাই।

অর্জ্জুন সেই "ব্যামিশ্র" বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য, যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২॥

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও। ২।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩॥

হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কর্ম্ম) যোগী-দিগের কর্ম্মযোগ বলিয়াছি। ৩।

এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

এই কর্ম্মের অননুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর, কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। ৪।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, তবে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে, কি তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি

কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে? না নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে?

কর্ম্মের অননুষ্ঠানে কেন নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্ বলিতেছেন,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫॥

কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫।

হে অর্জ্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় কি? জ্ঞানমার্গালম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা যায় কি?

জিজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে; কিন্তু যে সকল কার্য্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না?

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই

কর্ম্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে—যাহা কিছু করা যায়—তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বলিলে, কর্ম্মমাত্রই বুঝিতে হইবে; কেবল শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

যে বিমূঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী। ৬।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে কর্ম্মের অনমুষ্ঠানেই নৈষ্কর্ম্ম্য পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে যে নৈষ্কর্ম্ম্য ঘটে না, ভগবান্ তাহার এই প্রমাণ দিলেন. যে তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আর কর্ম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন. যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, "কর্ম্ম করিব না" বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

যদি কর্ম্মত্যাগও করা যায় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্ত্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মশূন্যতা হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মশূন্যতায় তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ৮।

"তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্ এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই, যে কর্ম্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর্ম্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। অতএব কর্ম্ম করিবে। তবে যদি কর্ম্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কর্ম্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটী নিয়ম কথিত হইল। প্রথম, ইন্দ্রিয় সকল * মনের দ্বারা সংযত করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। তদতিরিক্ত আর একটী নিয়ম আছে। তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে।

---

* ভাষ্যকারেরা বলেন,—কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্ব্বে যজ্ঞ বলিত,—যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে।

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ"। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। তিনি দ্রব্যাজনাদিক কর্ম্মকে যজ্ঞ বলেন।

শঙ্করাদি কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয়, যে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল কর্ম্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে।

তাহা হইলে, বিচার্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম তাহা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম কর্ম্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম্ম করিবে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্‌ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া এবং

জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থও কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ স্নানপান আহার-ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

এ কথা বুঝিবার জন্য, আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তুতি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদপ্রিয় ক্ষুদ্র-চেতা মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ, যাহাকে সাধারণতঃ "যাগ যজ্ঞ" বলে, পুষ্প, চন্দন নৈবেদ্য হোম বলি উৎসব এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টিসাধন—তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত।
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥"

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। আমরা ক্রমশঃ

ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

অতএব কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

যে কর্ম্মকর্ত্তা সে নিজেও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি সবিস্তারে ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে, যে "যজ্ঞ" ( যে অর্থেই হউক ) ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধন মাত্র। "বন্ধন" কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক এমন কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে তাহা বন্ধন স্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল—সুফলই হউক আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য, জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। যতদিন জন্মের পর জন্ম হইবে, ততদিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম্ম বন্ধন মাত্র।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই কি ধর্ম্মানুমোদিত? না নিষ্কাম কর্ম্মও যা, সকাম কর্ম্মও তা?

আমি ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুষ্যত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০।

পূর্ব্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে। ১০।

এখানে 'যজ্ঞ' শব্দে আর 'ঈশ্বর' নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই যজ্ঞ। এবং পরবর্ত্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল ঐ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটী শব্দ কোন অর্থ-বিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"Probably the sacrifices spoken of in that passage ( নবম শ্লোকে ) must be taken to be the same as those referred to in this passage." ডেবিস্ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ দিকে কামধুকের স্থানে *Kamduk* লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার !!!

এতক্ষণ ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্ সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ

দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ।

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না, যে যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিষ; প্রজাপতি যখন মনুষ্যসৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ এই যে বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এই টুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মানি না—মনুষ্য ত বানরের বিবর্ত্তন। তার পর, বেদ, নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না। পরিশেষে, প্রজাপতি যে প্রজাসৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না।

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব।

পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১।

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ

তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ১১।

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত করিবে, দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন।" আমরা ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে তদ্দত্ত (অন্ন) না দিয়া, যে খায় সে চোর। ১২।

শঙ্কর শ্রীধর স্বামী বলেন (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা," পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া যে খায়, সে চোর। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিভোজনম্ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীধর "পঞ্চযজ্ঞৈরদত্ত্বা" বলেন না, "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা" বলেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩।

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপভোজন করে। ১৩।

**অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।**
**যজ্ঞাদ্ভবন্তি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥**

অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন; পর্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জন্য জন্মে। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। ১৪।

পর্জন্য একটী বৈদিক দেবতা। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জন্য অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই হইবে।

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং বোধগম্য বটে। টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট।

তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি।

**কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।**
**তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥**

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও ; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত ; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫।

টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন, যে প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব বেদ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন ; স্থূল তাৎপর্য্যের বিঘ্ন কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের যে অনুবর্ত্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬।

( ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়ারাম। )

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের একভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; কেন না আমরা জানি কর্ম্ম করিলেই যজ্ঞ* হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (যথা রবিখন্দ), শস্য বিনাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে, ঋষিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর, বেদ হইতে কর্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রৌত কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই

* যদি বল, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই কর্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, তাহা হইলে "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ, (৫ম শ্লোক), এবং "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক ( unscientific ) কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব, যে গীতা, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রচার জন্য Huxley বা Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে যাহা তুমি ভগবদুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও অসত্যশূন্য হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সম্ভবে?

কিন্তু এই সাতটী শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অন্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজসঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্ত্তা সম্বন্ধে "প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ"* ? ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে "কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্যরচৎ।"* ? এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম

ধর্ম্মের সঙ্গে এই সাতটী শ্লোকের বিশেষ বিরোধ। এজন্য ইহা ভগবদুক্তি নহে—সঙ্কলনকর্ত্তার মত—ইহাই আমার বিশ্বাস।

তবে ইহাও আমার বক্তব্য, যে ইহা যদি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আমি "কৃষ্ণচরিত্রে" দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী, ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য্য করা অসম্ভব, কেন না কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই—মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে।

আর, এই বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয় ত মনুষ্য জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল* বা রোহিণী নক্ষত্র † বেড়াইয়া

* Great Bears. † Plerades.

আসিবে, হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ উপগ্রহবাসী কিম্ভূত কিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা সূর্য্যালোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে। মনে কর, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, শুনিবে কে? বুঝিবে কে? অনুবর্ত্তী হইবে কে? কেহ না। এইজন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্য রচনায় সাহসী।

এই সাতটী শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটী উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে, যে এই সাতটী শ্লোক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিরোধী। এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টী শ্লোক কেন এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মর্ম্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাঁহার কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নাম্নী টীকা হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে

সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই উদ্দোষণা হইল; কিন্তু "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্য কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। "প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও" ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কর্ম্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবে, তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রেরই জন্য যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা না করিলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে! ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও, কর্ম্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতটী শ্লোকের ভিতর একটী রহস্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া, ক্ষান্ত হইব।

গীতাকার বলিতেছেন যে,—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।*

এ কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় আছে,

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্॥" ১-২২ + ইত্যাদি।

যজ্ঞের দ্বারা যে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফলদান করেন, ইহা বৈদিক ধর্ম্মের স্থূলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম।

এখন, পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম্ম নাই, এবং হইতেও পারে না, যে তাহাতে উপধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধর্ম্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন?

কেহ কেহ বলেন, তাহার একবারে উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। যীশুখ্রীষ্ট নিজে যীহুদা ধর্ম্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন উপধর্ম্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃত দেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন

* ইহার অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম, প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই।

গীতাকারও বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে তাঁহার কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও লৌকিক ধর্ম্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে। এজন্য তিনি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি বৈদিক সকাম ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি।

যাহারা কর্ম্ম করে ( সকলেই কর্ম্ম করে ) তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। প্রথম, যাহারা নিষ্কামকর্ম্মী, এবং যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে "আত্মরতি" বা "আত্মারাম" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম্ম করে। ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগের "ইন্দ্রিয়ারাম" বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের

অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে, যে তাহারা "ইন্দ্রিয়ারাম" নহে—প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে। যদিও তাহাদের ধর্ম্ম উপধর্ম্ম মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপর্য্য আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা ইহাও বলিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য কাহাদের মতটা উদার? যাঁহারা বলেন যে অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের পথ, না যাঁহারা বলেন যে বৈধ হউক আর অবৈধ হউক উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের গ্রাহ্য? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার? যাঁহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে,—যে বলে যে নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে তেমনই উপাসনা করে।

গঙ্গা, বা Caspian Sea বা আমাদের লালদীঘি সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, Caspian Sea ও নহে, বা লালদীঘি নহে। "জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়," বলিলে কখনও বুঝাইবে না, যে গঙ্গা মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা Caspian Sea তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ

বিষ্ণু, অতএব "যজ্ঞার্থে" বলিলে "বিষ্ণ্বর্থে" বুঝিতে হইবে, এ কথা খাটে না।

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না এখন দেখা যাউক। আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তবে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্য্য এই, যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু একজন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন অবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে একজন মাত্র—আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।" এখন যাহা বলিবেন যে যদি "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে তাঁহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে, দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে, যে গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে, বা যোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ

গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্ত্তী কয়টী শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কর্ম্মই বুঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্য কর্ম্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্য "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্মজ্ঞের কর্ম্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে।

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে সামান্যতঃ অকর্ম্ম ( কর্ম্মশূন্যতা ) হইতে কাম্যকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টী কথিত হইয়াছে।

সেই পরবর্ত্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিম্নে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্ ধাতু দেবপূজার্থে। অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত,

সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ব্বদেবময়, যথা—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" ২৩॥

গীতা, ৯ অ।

সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ২৪॥

গীতা, ৯ অ।

যজ্ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত শ্লোকে তিনটী উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে—

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্।"

গীতা, ২৫, ১০ অ।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।"

গীতা, ২৫, ১০ অ।

অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যথা, মহাভারতে—

"বাক্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।"

শান্তি পর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয়।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু

আপত্তি আছে। একটী আপত্তি এই :—এই শ্লোকের পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর এমন অর্থ বুঝায় না। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ" "যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ" "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ" "যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবঃ" "যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্ত্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একার্থেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। 'হে যজ্ঞ !' বলিলে কেহই বুঝিবে না যে 'হে বিষ্ণো !' বলিয়া ডাকিতেছি। "বিষ্ণুর দশ অবতার" এ কথার পরিবর্ত্তে কখনও বলা যায় না যে "যজ্ঞের দশ অবতার"। "যজ্ঞ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বনমালী" বলিলে, লোকে হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন, যে যজ্ঞার্থে বিষ্ণু ? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ" যজ্ঞ বিষ্ণু ইহা বেদে আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে * কথিত আছে, যে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মখ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমং প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। স বঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সঃ। স যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ।"

অর্থ—ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য।"

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় "শিপি বিষ্টায়" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ, পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিষ্ঠতি।† ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ।"

অতএব শঙ্করাচার্য্যের কথা ঠিক—শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে, যে বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না সর্ব্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই

* ১৪।১।১।

† ইহা আমি Muir সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে।

বলিয়াছেন। তিনি বলেন "বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ সর্ব্বপ্রাণাদ্যন্তর্যামিত্বেন প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।"

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে,—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥"

গীতা, ৯অ, ১৬।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হবন।

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে। বিষ্ণু সর্ব্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র, তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি; কিন্তু মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে। অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা খাটে না।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাঁহার কার্য্য নাই। ১৭।

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। আবার এখন বলা হইতেছে যে ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম

নাই। অতএব কর্ম্ম বা কার্য্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি সকাম কর্ম্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাঁহার কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কর্ম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহাঁর প্রয়োজন নাই।১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তি লাভ করে। ১৯।

'অসক্ত' অর্থে আসক্তিশূন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই 'তস্মাৎ' (অতএব) শব্দ অতিশয় সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টী শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই 'তস্মাৎ' শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না! ৮ম শ্লোকে বলা হইল, যে কর্ম্ম না করিলে, তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা হইল, যে ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করে।

৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে, এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্ত্তী নয়টী শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্ত্তী কয়টী শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টী শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম্ম কর। ২০।

এই 'লোকসংগ্রহ' শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন, যে লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিলে সকলে কর্ম্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পর শ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার করিতেছেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

যে যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম নাই।

এক্ষণে কথিত হইতেছে যে কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে, সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে, স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞান-মার্গাবলম্বীর কর্ম্ম নাই ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষই কর্ম্মে অনুরাগশূন্য সুতরাং অকর্ম্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না—পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতিদত্ত-শিক্ষাবিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে। মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়যান-পর্ব্বাধ্যায়েও তিনি ঐরূপ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম :—

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ,

কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্র-মণ্ডলীপরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয় বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া

শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।"

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কর্ম্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। ২২।

কর্ম্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী হইবে। ২৩।

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন

এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্য তাঁহার কর্ম্ম নাই। তবে তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে, তিনি মনুষ্যধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার কর্ম্মও আছে। যদিও তিনি নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধর্ম্মিত্বহেতু কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কর্ম্মী। অতএব তিনি কদাচ আলস্যপরবশ হইয়া কর্ম্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী হইবে। যে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক সকল আমি উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিন্যহেতু হইব। ২৪।

ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য অতিশয় যত্নশীল; এজন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই আছে,—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।"

কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না, যে সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরে আলস্যে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না, যে ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাঙ্কর্য্য নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ব্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য্য এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না।

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে disorder বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য এই আমি বুঝি, যে তিনি কর্ম্মবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। আদর্শপুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলস্যপরবশ এবং কর্ম্মে অমনোযোগী হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া

কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। ২৫।

অবিদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে; বিদ্বানেরা লোক-রক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

বিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬।

যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে আমাদিগেরও এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। ২৭।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮॥

হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে বর্ত্তমান; এজন্য তাঁহারা কর্ম্মে আসক্ত হন না।

যাঁহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহারা উপরি-ব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের অর্থ বুঝিবেন না। ঐ দুই শ্লোক এবং তৎপূর্ব্বে বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে শরীর হইতে পৃথক্ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা হইতেছে যে অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানেরা কর্ম্মে আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্ জ্ঞানীরা কর্ম্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম্ম। যাঁহার আত্মজ্ঞান নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতেই ঘটিল; অতএব আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা। "আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" এই বিবেচনাই অহঙ্কার। সে বুঝে যে আমি কর্ম্ম করিয়াছি, এজন্য আমিই কর্ম্মের ফলভোগ করিব; তাই সে ফলকামনা করে। আর যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, ইন্দ্রিয় সকল আত্মার কোন অংশ নহে ইহা যাঁহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতিই কর্ম্ম করিল। কেন না, তদ্দ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত হইল। আত্মা কর্ম্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই আমি, অতএব

আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাঁহারা ফলকামনা করেন না। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞানী নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। এবং এই তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কর্ম্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মও কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দেখিব যে কথিত হইতেছে কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত হয়। সেই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন না। ২৯।

অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফল এমত ঘটিতে পারে, যে তাহারা সকাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবে না; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল, যে অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপকর্ম্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ *প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর, কর্ম্মের* মাহাত্ম্য ও অবশ্য কর্ত্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে সকলকে কর্ম্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম্ম না করিলেও, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে সে চিন্তা না করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে

না, তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
*প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥*

জ্ঞানবান্‌ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক।৩৪।

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানবান্‌ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য্য তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পীড়নের দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ

করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই যে স্বধর্ম্ম, এমন অর্থ করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্ম্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে, যে ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম্ম প্রচলিত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্য্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্ম্মই লোকের অনুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, যে ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্ম্মত্যাগ এবং পরধর্ম্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্ম্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাই ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তাঁহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু

পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয় এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে।

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

পরে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬।

পূর্ব্বে কথা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অর্জ্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে ইহাকে শত্রু বিবেচনা করিবে। ৩৭।

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি, তাহা

স্থানান্তরে কথিত হইবে। মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম দুষ্পূরণীয়, এজন্য মহাশন।

পাঠক দেখিবেন, যে কাম, ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায়, যে কাম ও ক্রোধ একই; দুইটী পৃথক্ রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে, ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম ক্রোধ একই।

তবে কথাটা এই হইল, যে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন না, স্বভাবই বলবান্; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধর্ম্মাশ্রয় করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিয়া, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মাত্রেরই বিষয়াকাঙ্ক্ষা বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্ব্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটী উদাহরণ প্রয়োগ করিব।

প্রথম, রাজার স্বধর্ম্ম, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্তা নহেন। এখানে Religion অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে রাজগণ ধর্ম্মনিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ, St. Bartholomew, Sicilian Vespers এবং স্পেনের Inquisition এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত

আছে, পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক Netherland দেশে দশলক্ষ মনুষ্য, কেবল রাজার ধর্ম্ম হইতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজ কাল, ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে, রাজার এরূপ পরধর্ম্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে, ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দু থাকিত ?

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ; বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, রেশম, পিত্তল কাঁসা, সব ধ্বংসপুরে গেল ;—আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে অন্তর্হিত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল ; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিল, যে আর উঠিল না। কোম্পানিকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে—আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিঙ্গটুকু আছে।

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্ম্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখ হানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভ সম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহমরণাভিলাষিণী হিন্দুমহিলা অবশ্যই বলিবেন,

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতোগর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥

যেমন ধূমে বহ্নি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে।

"জ্ঞান" শব্দটী মূলে নাই,—তৎপরিবর্ত্তে "ইদম্" আছে। কিন্তু পরশ্লোকে "জ্ঞান" শব্দই আবৃতের বিশেষ্য; এজন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল।

৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানবান্‌ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি"

জ্ঞানবান্ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্ম্মণ্য হয়।

উপমা তিনটী অতি চমৎকার; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক। "মল" শব্দে শঙ্করাচার্য্য "মল" অর্থাৎ "মলাই" বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, "মলেন" কিনা "আগন্তুকেন"। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে "মল" শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে।

উপমা তিনটীর প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই স্বাভাবিক। বহ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকিবে, নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের আবরণ কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্ব্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্ম; বহ্নি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক;— তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফুৎকারাদির দ্বারা

ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিম্বাবরণ, এবং প্রসবের দ্বারা উল্বণাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু, কামরূপে দুষ্পূর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে।

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু। ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে দুঃখদায়ক এবং ভোগকালেও যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখদায়ক, এই জন্য নিত্যশত্রু*। ইহা দুষ্পূর—কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই; এবং ইহা সন্তাপহেতু, এই জন্য অগ্নিতুল্য। ৩৯।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০।

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা হইতে পৃথক্। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে।

* ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর। ৪১।

যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে।

জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্ম-বিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, অথবা "জ্ঞান শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাস জাত।" শঙ্করাচার্য্য বলেন, "জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যলব্ধ আত্মাদির অবরোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই বিজ্ঞান। পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি বুঝি, যে এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে কাম, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, ও আত্মার উন্নতির বিনাশক।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২।

এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত

করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুরাসদ * শত্রুকে জয় কর। ৪৩।

পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে দুর্বোধ্য।

বলা হইতেছে, যে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে! তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র?।

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মন্দ্রিয়ই এখানে অভিপ্রেত।

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাদি শব্দের দ্বারা স্থূল পদার্থ বা স্থূলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ।

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে "আহুঃ" পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা

* দুরাসদ শব্দে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন।

নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্য দর্শন স্মরণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি।

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ।

১। প্রকৃতি।

২। মহৎ।

৩। অহঙ্কার।

৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়।

২০-২৪। পঞ্চ স্থূলভূত।

২৫। পুরুষ।

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূত। পুরুষ পরমাত্মা।

এই পর্য্যায়ানুসারে স্থূলভূত (ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি) হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্; কিন্তু সাংখ্য মতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অন্যগুলি বহিরিন্দ্রিয়। দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্য মত প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল প্রচারিত সাংখ্য।

গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আটটী মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটী স্থূলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পঞ্চভূতের গণনাতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে।* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন, যে ভগবান্ বলিতেছেন যে এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। অতএব কপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর।

যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটী অর্থ আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়। † এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ

---

* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫। ৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ইহাতে কাপিল সাংখ্যের ২৩টী গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটী আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কপিল সাংখ্য নহে। বরং কাপিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

† বেদান্তসার—২৮

বুঝিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অন্য সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দ্রিয় জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথায়ও কখনও কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না।*

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

---

* সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটী ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায়, যে "ইন্দ্রিয়-দোষ" বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসু হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন, যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বা তাঁহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দূষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না।

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ

# চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন।

এই অব্যয়যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১।

---

মৎস্যের অনেক সদ্‌গুণ আছে; কিন্তু মৎস্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক। অতএব মৎস্য মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মৎস্য মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মৎস্য হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) আলস্য পরিত্যাগ। আলস্য ইন্দ্রিয়দোষের একটী অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্যে কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,—অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্রিয়সুখচিন্তাই বলবতী হয়। অন্য কর্ম্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি চেষ্টাই প্রবল হয়। যাঁহার বিষয়কর্ম্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ শুভফল ফলিবে;—ইন্দ্রিয়ও শাসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্ম্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্ম্ম চিন্তার দোষ এই ঘটে, যে লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অবসর কালে সুসাহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। যাঁহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাগী তাঁহারা আপনার কার্য্য শেষ করিয়া পরের কার্য্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার

এই যোগের ফল অব্যয়, এজন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২।

(টীকা অনাবশ্যক।)

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

---

তত্ত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণের সুখস্বচ্ছন্দের তত্ত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহাতে যাঁহাদের মন না যায়, তাঁহারা কোনও গুরুতর পরকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ। যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, অশ্লীল আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা, ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও কলুষিত হইতে পারেন। সভ্য সমাজে বাসের একটী প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ।

(৫) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে—পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল।

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উত্তম। ৩।

( টীকা অনাবশ্যক। )

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে; আপনি যে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব? ৪।

( টীকা অনাবশ্যক। )

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরন্তপ! তুমি জান না।

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জ্জুন অবতারতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যে মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব

আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্নপ্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটী; আবার এ কথাও আছে যে অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটী কি দশটী কি বাইশটীর কথা বলিতেছেন না। "বহু" অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের "অসংখ্যেয়" এবং এই "বহু" শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা; সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি।

অজ—জন্মরহিত

অব্যয়াত্মা—যাঁহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই ( শঙ্কর )

ঈশ্বর—কর্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত ( শ্রীধর )

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ব্ব জগৎ যাহার বশীভূত।

এতদ্ব্যতীত মূলে যে "অধিষ্ঠায়" শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ "বশীকৃত্য" লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামী "স্বীকৃত্য" লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে।

স্থূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে

পারে, যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ ;—যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কর্ম্মাধীন,—যিনি ঈশ্বর, এজন্য কর্ম্মের অনধীন, তাঁহার জন্ম কেন?

উত্তরে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার বশে আছে, যদ্দ্বারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়, কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে।

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন, যে আমি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বত্বমূর্ত্তির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটী কথা বলা উচিত।

"মায়া" ঈশ্বরের একটী শক্তি। এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্ত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, যে তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫।

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন।

ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন; কেন না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্,—পারেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে* যথাসাধ্য করিয়াছি—পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর শরীর ধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্ নিজেই পর শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন।

* কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ডে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥

যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি। ৮।

সাধুগণের পরিত্রাণহেতু দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি*। ৯।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯॥

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহা যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,—আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯।

দিব্য অর্থে "অপ্রাকৃত", "ঐশ্বর", বা "অলৌকিক"।

ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কর্ম্মী। অতএব কর্ম্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কর্ম্মীর কর্ম্ম তত্ত্বতঃ বুঝা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত কর্ম্মযোগ, অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মযোগ কথনকালে এই অবতারতত্ত্ব উত্থাপনের

* এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকর্ম্মিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পূত, অনেকে মদ্ভাবগত হইয়াছে। ১০।

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-অনুরাগ। মন্ময়-ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ; শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলব্ধ মদ্ভাবগত, ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত।

ভাষ্যকারেরা বলেন, যে এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে আমাতে ভক্তিবাদ এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্ব্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্ত্তব্য যে যাঁহারা আদর্শ-কর্ম্মীর কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান ও তপের ( Spiritual culture ) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে না।

সকলেই নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্ম্মের কি কোনও ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্ম্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্ব প্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়।

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "প্রভো! আসল কথাটা কি, তাত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে কিছু পাইব না কি?

সেগুলা কি পণ্ডশ্রম ?" ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেই-রূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়।

তার পর দ্বিতীয় চরণ। "মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়," এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ হয়, যে, "আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সেই পথে চলে। এখানে সে অর্থ নহে—গীতাকারের "Idiom" ঠিক আমাদের "Idiom" সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, "উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।" "মানুষ যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে, কেন না এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই সর্ব্বদেব—অন্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই। এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই—ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই।" ইহা নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র

জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন ; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের. কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দন-সিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দূর লেপিয়া যায় ; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ জ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্ব্বতকে বল্মীক পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বর স্বরূপ অবগত নহেন—শিলা-খণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে ? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূল কথা, উপাসনা আমাদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য—ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টিবিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে তিনি বিচারক—কেন না কর্ম্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায়

স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্য্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না;—হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকার-বাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্র-দায়িক ধর্ম্ম—একমাত্র সর্ব্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২॥

ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেব-গণের আরাধনা করে। এবং শীঘ্র মনুষ্যলোকেই তাহাদের কর্ম্ম-সিদ্ধি হয়। ১২।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্ম্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়। সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অতি মহৎ। তবে

মহৎ ফলের আশা না করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব, যে যে সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি) কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকার-রহিত জানিও। ১৩।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শূদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসূক্তে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। উহার প্রথম ঋক্ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না,—তাঁহারা বলেন যে এই সূক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিক সূক্ত সবই অতি প্রাচীন ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

আমার বলিবার কথা, ঐ সূক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না, যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥"

শূদ্রের সম্বন্ধে "অজায়ত" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন। * বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্য।

* ডাক্তার হোগ্ এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Now, accouing to this passage, which is the most ancient and authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and *caste in general*, the Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the Brahmanical caste, that is to say, was transformed into it. The passage has no doubt an allegorical sense. (বেদের অনেক সূক্তে তাই) Mouth is the seat of speech. The allegory points out that the Brahmans are teachers and instructors of mankind. The arms are the seat of strength. If the two arms of the Purusha are said to have been made a Kshattriya (warrior), that means, then, that the Kshattriyas have to carry arms to defend the empire. That the thighs of the Purusha were transformed into the Vaisya, that, as the lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya caste is destined to

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে ( মধ্যতঃ ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।" শূদ্রের কথা নাই। *

পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—

---

provide food for the others." ( এটুকু বড় কষ্ট কল্পনা,—উরুতে ডাল ভাত যায় না—কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ" তার পর ) "The creation of the Sudra from the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the other parts of the body as a firm support." *Dr. Haug on the origin of Brahmanism. p.* 4.

Dr. Muir ও বলেন, "It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha's feet ; but as regards the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not quite clear which ( *i. e.* ) the castes or the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12. ( উদ্ধৃত ঋক্ ) to declare that the three castes where the three members or conversely that the three members were, or became the three castes."—***Sanskrit Texts Vol. II, p. 15, 2nd Edition.***

* ২।১।৪।১১ ইত্যাদি।

"ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ। যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।" * অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম। এখানেও শূদ্রের কথা নাই।

উদাহরণ স্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন, যে আমি আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক গুণ কাহাকে বলে।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি; সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্যযুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এইরূপ গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায়।

এক্ষণে, যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য, বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্ট হয়? যিনি বলিবেন, যে আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে

* ৩।১২।৯।২

মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে, এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্ব্বে, প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা,—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

পুনশ্চ—

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

গৌতমসংহিতা।

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫

অধ্যায়ে ঋষিবাক্য আছে, "পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম, ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্য, দান ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।"

কিন্তু হইতেছিল, নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের কথা, কর্ম্মের ফলকামনার কথা,—চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যজনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কর্ম্ম করেন? করেন বৈ কি? কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। কেন না তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্ম্মফলের অধীন হইতে পারেন না—তাঁহার সুখ দুঃখ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের

অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম্ম নিষ্কাম। তিনি নিষ্কাম-কর্ম্মা। মনুষ্যও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকর্ম্মীই মুক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর কর্ম্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপন নিয়মে ( Law ) নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম্ম। যাঁহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ। যদি তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্ম্মে ফল-স্পৃহা নাই। এইরূপ আমায় যে জানে, সে কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না।

ঈশ্বরের নিষ্কামকর্ম্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব্ব শ্লোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট করা গিয়াছে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতমং কৃতং॥ ১৫॥

এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্ব্বগামীদিগের পূর্ব্বকাল-কৃত কর্ম্ম সকল কর। ১৫।

অর্থাৎ প্রাচীনকালে যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া—কর্ম্মের ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১৬॥

কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম্ম কি তাহা তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬।

অকর্ম্ম অর্থে এখানে মন্দকর্ম্ম নহে—অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥ ১৭॥

কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। ১৭।

কর্ম্ম,—অর্থে বিহিত কর্ম্ম, যাহা যথার্থ কর্ম্ম।

বিকর্ম্ম—অবিহিত কর্ম্ম।

অকর্ম্ম—কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সংযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যে কর্ম্মেতেও কর্ম্মশূন্যতা দেখে, এবং অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সর্ব্বকর্ম্মকারী। ১৮।

ভগবদারাধনা কর্ম্ম; কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কর্ম্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম্ম বিহিত, তাহা করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এজন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্মকেই কর্ম্ম বিবেচনা করিবে। শ্রীধরের টীকার মর্ম্মার্থ এই। ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায়, যে ভগবদারাধনাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্ন।

শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটী দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্থূল কথা এই—আত্মা ক্রিয়ানির্লিপ্ত; কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মারোপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানেন তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন। আর ইন্দ্রিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম দেখেন।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায়। কামসংকল্প-বিবর্জ্জিত, ফলকামনাশূন্য যে কর্ম্ম, সে অকর্ম্ম—কর্ম্মশূন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বিরত, তাঁহার কর্ত্তব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই

আছে—অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতাও কর্ম্ম। কেন না ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯।

"কামসঙ্কল্প" এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ এই ;—"কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ," "কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্বর্জ্জিতাঃ"। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, "কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জিতাঃ। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-বিবর্জিত হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা করে না, সে কর্ম্ম করিবে কেন? এজন্য শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন, "মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।" অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমারম্ভ সকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে, কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, যে তাহা হইলেও কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতীও "লোকশিক্ষার্থং" ও "জীবনযাত্রার্থং" কথা দুইটা রাখিয়াছেন, কিন্তু কামসঙ্কল্পবর্জিত" পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্মশূন্যতা।

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—এবং আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে দুইয়ের অভাবই কর্ম্মের লক্ষণ, কর্ম্মে তদুভয়ের অভাবই কর্ম্মশূন্যতা।

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি? ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ নাই—এমন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা পূর্ব্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক।

কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্ম্মের ফলকামনা করে না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে না—মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয়। যে শূল রোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্মুখ, বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্ত-প্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শত্রুকে

উদ্ধার কালে মনে হইতে পারে, "আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।" এখানে ফল কামনা নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে।

তবে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে নিষ্কাম কর্ম্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কামশব্দ গীতায়, বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় না, যে তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটী অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কথনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটী অপবর্গ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থে, ইহা ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন নাই। যাহা, ধর্ম্ম, অর্থ, অর্থাৎ ঐহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের অতিরিক্ত তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্ম্মের দ্বারা, স্বর্গাদি লাভ সাধনকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্য কর্ম্মজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ। অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষ্কাম নহে।

কামশব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে।

> ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
> বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
> স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্॥

পাঁচটী ইন্দ্রিয় মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, আমার বিবেচনায়, তাহাই কাম। তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।

অতএব কাম অর্থে আত্মসুখ।

এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহারি কর্ম্ম নিষ্কাম। আর যদি আপনার যশ, মান সম্ভ্রম, উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্মা।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। ২০।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যিনি কামনা ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না; যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট; দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈর-

বিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না। ২১। ২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যথার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। ২৩।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব স্তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি, ব্রহ্ম, ও যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এই প্রকার কর্ম্ম স্বরূপ ব্রহ্মে যাহার সমাধি হইয়াছে তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

কতকগুলি যোগী সম্যক্‌রূপে দেবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আ:

কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন। ২৬।

**সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।**
**আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥**

কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা উদ্দীপিত আত্ম-ধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম্ম সকল আহুতি প্রদান করেন। ২৭।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দৃঢ়ব্রত যতিগণ, দ্রব্যদান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান এই কয়েকটী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।২৮।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপান বৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া পূরক, অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক এবং প্রাণ অপানের গতি রোধ করিয়া কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদয়কে হোম করিয়া থাকেন। ২৯।

**সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।**
**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥**

এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন, এবং যজ্ঞ শেষ রূপ অমৃত ভোজন করত সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। ৩০।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১।

হে কুরুসত্তম! যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকও নাই। ৩১।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥

এইরূপ ভূরি ভূরি যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত আছে, তৎসমুদয়ই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, তুমি এইরূপ অবগত হইয়া (জ্ঞাননিষ্ঠ) হইলে মুক্তি লাভ করিবে। ৩২।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥

হে পরন্তপ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে; অতএব হে পার্থ! দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। ৩৩।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪॥

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন। ৩৪।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫॥

জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না; তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। ৩৫।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ৩৭।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ইহ লোকে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। ৩৮।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরাৎ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। ৩৯।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০॥

কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও নাই। ৪০।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগ দ্বারা কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন; কর্ম্ম সকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। ৪১।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

অতএব আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়নিহিত অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয় ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! উঠ। ৪২।

ইতি জ্ঞানবিভাগযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

# পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি সন্ন্যাস (ত্যাগ) ও কর্ম্ম-যোগ উভয়ের কথাই কহিতেছ; এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা অবধারিত করিয়া বল। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ২।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই (কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও) নিত্য সন্ন্যাসী; কারণ তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই অনা-য়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ৩।

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪॥

মূর্খেরাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে, কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন না; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ের মধ্যে একটীর সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন। ৪।

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫॥

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্ম-যোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬॥

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস, দুঃখ প্রাপ্তির কারণ, কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। ৬।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭॥

যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়-গণ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। ৭।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৮॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯॥

পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগী, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন, (ভোজন), গমন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন আমি কিছুই করিতেছি না; ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। ৮-৯।

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥

যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না। ১০।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১॥

কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর মন বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধি বর্জ্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ১১।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥

পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল [illegible] করিয়া কৈবল্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন; কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ ব্যক্তি [illegible] বশতঃ ফলপ্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয়। ১২।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না ও অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না। ১৩।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর জীবলোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মফলভাগী করেন না; স্বভাবই তৎ সমুদয়ের প্রবর্ত্তক। ১৪।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীব সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে। ১৫।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা জ্ঞানদ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ১৬।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরই যাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। ১৭।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন। ১৮।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন; নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শী ব্যক্তিরা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না; কেন না, তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ২০।

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন, পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। ২১।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না। ২২।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। ২৩।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম ও আত্মাতেই যাঁহার সুখদৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। ২৪।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

যাঁহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষলাভ করেন। ২৫।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬॥

যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষলাভ করেন। ২৬।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮॥

যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে (রূপরসাদি) বাহ্য বিষয় সকল বহিস্কৃত, নয়নদ্বয় ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান-বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া, ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূর-পরাহত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ২৭ ২৮।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

মানবগণ, আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও সুহৃৎ জানিয়া শান্তি লাভ করেন। ২৯।

ইতি কর্ম্মসন্ন্যাসযোগোনাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞকর্ম্মাদি) ও পূর্ত্ত (পুষ্করিণী খননাদি প্রভৃতি) কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন। ১।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

হে পাণ্ডব! পণ্ডিতেরা যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ; অতএব কর্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে যোগী হইতে পারে না। ২।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়; আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়। ৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাধন কর্ম্মে আসক্ত না হন, তিনি তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ৪।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আত্মা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু। ৫।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। ৬।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ও মান অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। ৭।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি

নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সম জ্ঞান করেন, সেই যোগী যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হন। ৮।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯॥

যিনি সুহৃদ্, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৯।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০॥

যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান করিবেন। ১০।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥১১॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২॥

জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্র-মনে পবিত্রস্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত অনতি উচ্চ অনতি নীচ স্থিরতর আসন সংস্থাপন করত, তাহাতে উপ-বেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। ১১.২।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিতং।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বায় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে; যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। ১৩।১৪।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে আমার সারূপ্যরূপ মোক্ষ প্রধান শান্তিলাভ করে। ১৫।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। ১৬।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যাহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখবিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। ১৭।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। ১৮।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯॥

জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠান কালে নির্ব্বাত, নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। ১৯।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০॥

যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়। ২০।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্র-লভ্য অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না। ২১।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২॥

যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না

এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচালিত করিতে পারে না। ২২।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪।

সেই অবস্থার নামই যোগ। তাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ও নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে অভ্যাস করিবে। সংকল্প-সমুৎপন্ন কামনা সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। ২৩। ২৪।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধির দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ২৫।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে। সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে। ২৬।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশান্তচিত্ত রজোবিহীন, নিষ্পাপ, জীবন্মুক্ত যোগী নিরতিশয় সুখলাভ করেন। ২৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ জনিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন। ২৮।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। ২৯।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না। ৩০।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ

মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। ৩১।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখ দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না। ৩৩।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

মন স্বভাবত চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও দুর্ভেদ্য, যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে। ৩৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ তাহার সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়। ৩৫।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬॥

যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট, যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ। ৩৬।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি (প্রথমে) শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু পরে যত্নহীন হইয়া যোগভ্রষ্টচেতা হয়, সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়?। ৩৭।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮॥

হে মহাবাহো! সে কি যোগ ও কর্ম্ম (মোক্ষ ও স্বর্গ) উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম লাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না?। ৩৮।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। ৩৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, কি ইহ-লোকে কি পরলোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না; (কারণ) কোন শুভকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ৪০।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধন সম্পন্নদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ৪১।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥৪২॥

অথবা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করে; যোগী-দিগের কুলে জন্ম অতি দুর্ল্লভ। ৪২।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভ বিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে।৪৩।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে, তখন সে যোগজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করে। ৪৪।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

নিষ্পাপযোগী অধিকতর যত্ন সহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ৪৫।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। ৪৬।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, সে আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। ৪৭।

ইতি অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

# সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাসপূর্ব্বক, যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥

আমি যে অনুভব সহকৃত জ্ঞান সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা বিদিত হইলে শ্রেয় বিষয়ে আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না। ২।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, আর যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। ৩।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

আমার মায়ারূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটপ্রকারে বিভক্ত। ৪।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্ট), এতদ্ভিন্ন আর একটী জীবস্বরূপ পরা (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ চেতনাময়ী) প্রকৃতি আছে; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ৫।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা। ৬।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; যেমন সূত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। ৭।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে,

সমুদয় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে অবস্থান করিতেছি। ৮।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। ৯।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বিদিত হও, আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ। ১০।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের কাম ও রাগ রহিত বা পরাকাঙ্ক্ষাশূন্য বল ও সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম। ১১।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি। ১২।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

জগতীস্থ সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না। ১৩।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ১৪।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ মায়া দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা আসুর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মকারী, নরাধম, মূর্খ, কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। ১৫।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভঃ ॥ ১৬ ॥

আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। ১৬।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানবানের ও জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। ১৭।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ তিনি মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করতঃ আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১৮।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বহু জন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্ল্লভ। ১৯।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও কামমদ দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া প্রসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। ২০।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই অচল শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি। ২১।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

তাঁহারা সেই শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করেন; তৎপরে আমা হইতেই হিতকর অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২২।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবলব্ধ ফল সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়, দেবযাজী ব্যক্তিরা দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

আমি অব্যক্ত কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার নিত্য সর্ব্বদা অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য মীন ও কূর্ম্মাদি ভাবাপন্ন মনে করে। ২৪।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি সকলের সমক্ষে কদা প্রকাশমান হই না এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্য বলিয়া অবগত নয়। ২৫।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নয়। ২৬।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

হে শক্রতাপন ভারত! জন্মগ্রহণ করিলে ভূত সকল ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে। ২৭।

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর ব্রত পরায়ণ মহাত্মারাই আমাকে আরাধনা করেন। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥

যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা মৃত্যু হইতে বিনির্মুক্ত হইবার যত্ন করেন তাঁহারাই সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কর্ম্ম সনাতনব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হন। ২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যু-কালেও আমাকে বিস্মৃত হন না। ৩০।

ইতি জ্ঞান বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কাহাকে কহে? অভিভূত ও অধিদৈবই বা কি? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কি এবং সেই অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সংযত চিত্ত বক্তিরা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হন। ১। ২।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন! যিনি অব্যয় ও জগতের মূল কারণ তিনিই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়; যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেই কর্ম্ম। ৩।

অধিভূতঃ ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

নশ্বর দেহাদি পদার্থ ভূত সকলকে অধিকার করিয়া থাকে ; এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাহাকে অধিদৈবত বলা যায়; আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। ৪।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ৫।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

অতএব সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর : আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে।৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

হে পার্থ। অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়। ৮।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

কবি, পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ অজ্ঞানান্ধকারের উপরি বর্ত্তমান পরমদিব্য পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন, তিনিই মৃত্যু-কালে অবিচলিত চিত্তে ভক্তি ও যোগবলে ভ্রূযুগল মধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯। ১০।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তি শূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার

নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপ্যবস্তু লাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বার সমুদয় সংযত হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগ জনিত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান ( বাচক ) "ওঁ" এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ১২। ১৩।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪ ॥

যিনি অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত-চিত্ত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন। ১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫ ॥

মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ও মোক্ষরূপ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৬।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

দৈব সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। যাহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা। ১৭।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণ রূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। ১৮।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

সেই ভূত সমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে বিলীন হয়, এবং পুনরায় দিবাসমাগমে কর্ম্মাদি পরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রি সমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। ১৯।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

সেই চরাচরের কারণ রূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর, অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন, আর একটী ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। ২০।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

যে অব্যক্ত ভাব অক্ষয় বলিয়া বেদে উক্ত আছে তাহাকে পরমাগতি কহে; যাহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, তাহাই আমার পরম ধাম। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূত সকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ২২।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ॥
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। ২৩।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

যে স্থানে দিবস শুক্ল বর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এবং ছয়মাস উত্তরায়ণ ব্রহ্মবেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪।

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন কর্ম্মযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গলাভ করিয়া নিবৃত্ত হন ও পুনরায় সংসারে আগমন করেন। ২৫।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী শাশ্বত গতি আছে, তন্মধ্যে একতরদ্বারা অনাবৃত্তি ও অন্যতর দ্বারা আবৃত্তি হইয়া থাকে। ২৬।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হন না; অতএব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠান পরায়ণ হও। ২৭।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্রে বেদ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল কারণ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৮।

ইতি ব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

# নবম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে আমি সেই গোপনীয় উপাসনা-সহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, রাজগণের ও গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্ম্মানুগত ও অব্যক্ত; ইহা অনায়াসেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। ২।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

হে পরন্তপ! যাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-পরিকীর্ণ সংসার-পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, আমাতে ভূত সকল অবস্থান করিতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। ৪।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না, আমার এই ঐশিকী অঘটনঘটনাচাতুরী নিরীক্ষণ কর; আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে; কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে। তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে। ৬।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়কালে ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয় এবং কল্পপ্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৭।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে প্রলয়কালবিলীন কর্ম্মাদিপরবশ ভূত সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি। ৮।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তন্তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের আয়ত্ত নহি, আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। ৯।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

মায়া আমার অধিষ্ঠান মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ১০।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

আমি সকল ভূতের ঈশ্বর, আমি মানুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। বিফল আশাসম্পন্ন, বিফলকর্ম্ম-পরায়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন ব্যক্তিরা রাক্ষসী, আসুরী, ও মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে। ১১। ১২।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং॥ ১৩।

কিন্তু হে পার্থ! মহাত্মগণ দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্যমনে আরাধনা করেন। ১৩।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

সতত ভক্তিযুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার নামকীর্ত্তন এবং যত্নবান্ নিয়মী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥

আর কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদি রূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। ১৫।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম।১৬।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭॥

আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ মাতা ও বিধাতা। আমি পবিত্র, জ্ঞেয় বস্তু, ওঁকার, ঋক্ সাম যজু। ১৭।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮॥

আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়ের স্থান ও অব্যয় বীজ। ১৮।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯॥

আমি উত্তাপ প্রদান, বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু ও সৎ, অসৎ। একারণ লোকে আমাকে নানারূপে উপাসনা করিয়া থাকে। ১৯।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

হে অর্জ্জুন! ত্রিবেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। ২০।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১॥

অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন; এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। ২১।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥২২॥

যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। ২২।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩॥

হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। ২৩।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ২৪।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ২৫॥

দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণকে, পিতৃব্রত-নিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণকে ও ভূতসেবকেরা ভূত সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়। ২৫।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যিনি ভক্তি সহকারে আমাকে ফল পত্র পুষ্প ও তোয় প্রদান করেন, আমি সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির সেই সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি। ২৬।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, যে বস্তু দান ও যে তপঃসাধন করিয়া থাক তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও। ২৭।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

তাহা হইলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ম্মার্পণ রূপ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। ২৮।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

আমি সকল ভূতে একরূপ; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই; যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করিয়া থাকে এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি। ২৯।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

যদি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে, তবে সেই সাধু; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর। ৩০।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না। ৩১।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২॥

হে পার্থ! যাহারা নিকৃষ্ট-কুলজাত বা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত শূদ্র ও যাহারা স্ত্রীলোক, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। ৩২।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥

অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণ (যে পরমগতি লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?) তুমি এই অনিত্য অসুখকর (মর্ত্ত্য) লোক প্রাপ্ত হইয়া আমার আরাধনা কর। ৩৩।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪॥

আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, সর্ব্বদা আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে। ৩৪।

ইতি রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥

---

# দশম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে মহাবাহো! তুমি আমার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছ; এক্ষণে আমি তোমার হিত বাসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি; তাহা শ্রবণ কর। ১।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভব অবগত নন (যেহেতু) আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি। ২।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন তিনি জীবলোকে মোহবিরহিত ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ৩।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে। ৪। ৫।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বতন সনক সনন্দাদি চারিজন ও ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি এবং স্বায়ংভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

যিনি আমার এই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। ৭।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চ্চনা করেন। ৮।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

তাঁহারা আমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হন এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৯।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত উপাসকদিগকে বুদ্ধি প্রদান করি, তাঁহারা তদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিবারণ করিয়া থাকি। ১১।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে বাসুদেব! তুমি পরম ব্রহ্ম পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য আদিদেব, জন্মবিহীন ও সর্ব্বব্যাপক, ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল ও ব্যাসদেব ইহাঁরা সকলেই তোমাকে উক্তরূপ কহিয়া থাকেন এবং তুমিও আপনাকে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে। ১২-১৩।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪॥

হে কেশব এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ আমি তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ করিনা; হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেহই তোমাকে সম্যক্ অবগত নন্। ১৪।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫॥

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতেশ! হে জগৎপতে! হে দেবদেব! হে ভূতভাবন! তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। ১৫।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥১৬॥

তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর। ১৬।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭॥

হে যোগিন্! আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব। ১৭।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮॥

এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তরে আপনার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কীর্ত্তন কর; তোমার অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। ১৮।

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই, অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি সকল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৯।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০॥

আমি আত্মা ও সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি, আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। ২০।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১॥

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ২১।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২॥

আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য। ২২।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩॥

আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর ও যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু। ২৩।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪॥

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর। ২৪।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫॥

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। ২৫।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

আমি বৃক্ষ সমূহের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধ সমুদয়ের মধ্যে মহামুনি কপিল। ২৬।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

আমি অশ্বগণ মধ্যে অমৃতমন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গ মধ্যে ঐরাবত, মনুষ্য মধ্যে রাজা। ২৭।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

আমি আয়ুধ মধ্যে বজ্র ও ধেনুগণ মধ্যে কামধেনু, আমি পুত্রোৎপত্তি হেতু কন্দর্প, সবিষসর্পগণ মধ্যে বাসুকি। ২৮।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

নির্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচর সকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা ও নিয়মিগণের মধ্যে যম। ২৯।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, পক্ষী মধ্যে গরুড়। ৩০।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী। ৩১।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি সৃষ্ট পদার্থ সকলের আদি অন্ত ও মধ্য, বিদ্যা সকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা; আমি বাদিগণের বাদ। ৩২।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, ও সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমি অনন্তকালও সর্ব্বতোমুখ বিধাতা। ৩৩।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

আমি সর্ব্ব সংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয়লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা ধৃতি ও ক্ষমা। ৩৪।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ৩৫।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

আমি প্রতারকদিগের দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজ; আমি জয়, অধ্যবসায়, সত্ত্ববান্‌দিগের সত্ত্ব। ৩৬।

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা। ৩৭।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্যবিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্‌দিগের জ্ঞান। ৩৮।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি সকল ভূতের বীজ, এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নয়। ৩৯।

নাস্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই, আমি সংক্ষেপে এই বিভূতি-বিস্তার কীর্ত্তন করিলাম। ৪০।

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা॥
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥ ৪১ ॥

বস্তুতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব-বল-সম্পন্ন, সেই সমস্ত আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে। ৪১।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২ ॥

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথক্‌রূপে জানিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি একাংশ দ্বারা এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। ৪২।

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

# একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে তদ্দ্বারা আমার (আমি হন্তা, ইহারা হত হইতেছে এইরূপ) মোহ দূর হইল ১।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম। ২।

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥*

হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার ঐশিকরূপের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলে আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি। ৩।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার

সম্যক্ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর। ৪।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ! তুমি আমার নানাবর্ণ ও নানাপ্রকার আকার বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। ৫।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

হে ভারত! অদ্য আমার কলেবরে আদিত্য বসু রুদ্র ও মরুদ্গণ, অশ্বিনীতনয়দ্বয়, এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য অন্য বহুতর বস্তু সকল দেখ। ৬।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

হে গুড়াকেশ! আমার দেহে সচরাচর বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে তাহাও নিরীক্ষণ কর। ৭।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

কিন্তু তুমি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ

হইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি, তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর। ৮।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯॥

সঞ্জয় কহিলেন। হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম ঐশিকরূপ প্রদর্শন করিলেন। ৯।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০॥

(তাহা) বহুমুখ ও বহুনয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ুধধারী। ১০।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১॥

দিব্যমালা ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্যগন্ধ-চর্চ্চিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট। ১১।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২॥

যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয় তাহা হইলে তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ১২।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩॥

ধনঞ্জয় তাঁহার দেহে বহুপ্রকারে বিভক্ত একস্থানস্থিত সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। ১৩।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অর্জ্জুন সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন। ১৪।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে দেব! আমি তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। ১৫।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্র সম্পন্ন অনন্তরূপ নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭॥

আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত হুতাশন-সূর্য্য-সঙ্কাশ তেজতুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি ১৭।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮॥

তুমি অক্ষয় পরমব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, শাশ্বত ধর্ম্মপ্রতিপালক ও সনাতন (ইহা) জানি। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯॥

তুমি উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-রহিত, তুমি অনন্তবীর্য্য ও অনন্ত-বাহু, হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে; চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ। ১৯।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ।

হে মহাত্মন্! তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌পুঞ্জে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে। ২০।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ।

এই সকল সুরগণ শঙ্কিত মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন; কেহ কেহ বা আমাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ২১।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর,

বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। ২২।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩।

হে মহাবাহো! আমি এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে তোমার বহু নয়ন ও অনেকমুখসম্পন্ন, বহুবাহু, বহু উরু ও বহু-চরণসংযুক্ত, অনেক-উদর-পরিশোভিত ও বহুদংষ্ট্রাকরাল আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি। ২৩।

নভঃ স্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥ ২৪॥

হে বিষ্ণো! আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী, বহুবর্ণসম্পন্ন বিবৃতানন, বিশাললোচন, ও অতি প্রদীপ্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। ২৪।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈ্ব কালানলসন্নিভানি।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

হে দেবেশ ! তোমার কালাগ্নি-সন্নিভ, দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছে ; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; হে জগন্নিবাস ! তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, অন্যান্য মহীপালগণ আমাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে সত্বরে তোমার ভয়ঙ্কর আস্যবিবরে প্রবেশ করিতেছেন; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়াছে। ২৬। ২৭।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক বেগশালী পতঙ্গ সকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সকল লোকেরা বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ২৯।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ।

তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদয় লোককে গ্রাস করিতেছ। হে বিষ্ণো! তোমার প্রখর তেজ বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১॥

এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার করি; হে দেববর! তুমি প্রসন্ন হও। আদি পুরুষ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি; কেননা কি জন্য তোমার এরূপ চেষ্টা আমি তাহা জানি না। ৩১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন। ৩২।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় করত যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই

ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি ; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্ত মাত্র হও। ৩৩।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪ ॥

আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর ; ব্যথিত হইও না, অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। ৩৪।

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন। কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন কম্পিত-কলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করত ভীত মনে গদ্গদ বচনে কহিলেন। ৩৫।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ! তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে তাহা যুক্তিযুক্ত। ৩৬।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ভগবান্ ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও তাঁহার আদি কর্ত্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূল কারণ অবিনাশী ব্রহ্ম, এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে। ৩৭।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান। তুমি বিশ্বের জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম। তুমি এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। ৩৮।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ, আমি তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি। ৩৯।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি, আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি; আমি তোমার চতুর্দ্দিকেই নমস্কার করি; তুমি অনন্তবীর্য্য অমিতপরাক্রমসম্পন্ন, তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ৪০।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

এেকাহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়পূর্ব্বক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বন্ধুজন সমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন উপবেশন ও ভোজন বিষয়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর। ৪১। ৪২।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

হে অপ্রতিমপ্রভাব! তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু; ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই। ৪৩।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

হে দেব! অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের,

স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে তাহার সন্দেহ নাই। ৪৪।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫॥

হে দেব! আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর। ৪৫।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬॥

কিরীটসমলঙ্কৃত, গদাচক্রলাঞ্ছিত সেই পূর্ব্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তি! এক্ষণে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর। ৪৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যে ন হি দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন মনে যোগ-মায়ার প্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বস্বরূপ পরমরূপ প্রদর্শন করিয়াছি তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করেন নাই। ৪৭।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

হে কুরুপ্রবীর! তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। ৪৮।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না, এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীত মনে পুনরায় আমার পূর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। ৪৯।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনঃ স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বরূপদর্শনভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। ৫০।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানুষমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, দেবগণ উহা নেত্র গোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। ৫২।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। ৫৩।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ৫৪।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সঃ মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তিরহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৫।

ইতি বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১।

অর্জ্জুন কহিলেন। (হে কৃষ্ণ!) যে সকল ভক্ত তদ্গতচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়? ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২।

শ্রীভগবান্ কহিলেন। (হে অর্জ্জুন!) যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে তাহারাই প্রধান যোগী। ২।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠাননিরত

ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন, কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ৩।৪।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ৫।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। ৬।৭।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

তুমি আমাতে স্থিরতররূপে চিত্ত আহিত (স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৮।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর। ৯।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

যদি তদ্বিষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ মঙ্গল কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। ১০।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

যদি ইহাতেও অশক্ত হও তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর। ১১।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলপরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফলপরিত্যাগ করিলেই শান্তি লাভ হয়। ১২।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৩।১৪।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

লোক সকল যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করেন না এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ, ( বিবাদ ), ভয় ও উদ্বেগ শূন্য তিনিই আমার প্রিয়। ১৫।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত, ও আধি (মনঃপীড়া) শূন্য এবং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—যিনি সকাম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৬।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পুণ্য পাপ, পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান্ হন তিনিই আমার প্রিয়। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি সর্ব্ব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন ও যিনি মৌনী, যিনি যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থির-মতি ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৮। ১৯।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্তপ্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার অতীব প্রিয়। ২০।

ইতি ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কেশব! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন! এই ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকে, যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ২।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান। ৩।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকার-যুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৪।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণীতার্থ বহুবিধ বেদ, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন। ৫।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ ইন্দ্রিয়—বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীরজ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য এই কয়েকটী ক্ষেত্রধর্ম্ম। উক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদিবিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ৬। ৭।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১১॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১২॥

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা (গুরুসেবা) শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, এবং জন্ম, মৃত্যু জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারংবার সমালোচন, প্রীতিত্যাগ এবং পুত্রকলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পদার্থের স্বরূপ-দর্শন, ইহাই জ্ঞান ; ইহারই বিপরীতই অজ্ঞান। ৮। ১২।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩॥

এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ; উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সৎও নন, অসৎ ও নন। ১৩।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার কর চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে; তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৪।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

তিনিই ন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার, তিনি নির্গুণ কিন্তু সর্ব্বগুণপালক। ১৫।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তর ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়; তিনি জ্ঞানিদিগের অতি সন্নিকৃষ্ট ও অজ্ঞানদিগের দূরবর্ত্তী ১৬।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূতগণের পোষক; তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন ও সৃষ্টিকালে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ১৭।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ ও অন্ধকারের অতীত; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ১৮।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয়। ১৯।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিবিকার এবং সুখ দুঃখাদি গুণ সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।২০।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখ দুঃখ ভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ। ২১। ২২।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ।২৩॥

তিনি এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ তিনি সাক্ষিস্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্ত্তা, প্রতিপালক মহেশ্বর ও অন্তর্যামী। ২৩।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ২৪।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

কেহ কেহ ধ্যান ও মনন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে; কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ২৫।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অন্যের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। ২৬।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

হে ভরতর্ষভ! ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে। ২৭।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হন না, তিনি সকল ভূতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন তিনিই যথার্থ দেখিতেছেন। ২৮।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৯ ॥

লোক সকল সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিদ্যার দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না, এই নিমিত্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ২৯।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সমুদয় সম্পাদন করেন, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যক্‌দর্শী। ৩০।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১॥

যখন লোকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূত সকলের ভিন্নভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥৩২॥

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্ম্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হন না। ৩২।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩॥

যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক গুণ দোষ দ্বারা কখনই লিপ্ত হন না। ৩৩।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪॥

হে ভারত! যেমন সূর্য্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ৩৪।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫॥

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৫।

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষিগণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। ১।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

ইহা আশ্রয় করিলে আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না। ২।

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

হে ভারত! মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধান স্থান; আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। ৩।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক

মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি সমুদায়ের যোনি (মাতৃ-স্থানীয়) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। ৪।

সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫॥

হে মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিনটী গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে। ৫।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬॥

হে নিষ্পাপ! তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্কর ও নিরুপদ্রব; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে সুখী ও জ্ঞান-সম্পন্ন করে। ৬।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥

রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত, উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। ৭।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮॥

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক; উহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে। ৮।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। ৯।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়। ১০।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয়-দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে। ১১।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ-স্পৃহা ও অশান্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। ১২।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে বিবেক ভ্রংশ অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত হয়। ১৩।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয়, রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে, আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয়। ১৪। ১৫।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। ১৬।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে। ১৭।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

সাত্ত্বিকলোক ঊর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থান

করেন এবং জঘন্যগুণসঞ্জাত প্রমাদমোহাদির বশীভূত তামসিক লোকেরা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। ১৮।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

মানব বিবেকী হইয়া গুণ সকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০॥

দেহী দেহসম্ভূত এই তিনটী গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু জরাজনিত দুঃখপরম্পরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ২০।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন সকল চিহ্ন ও কিরূপ আচার সম্পন্ন হইলে এই তিনটী গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন? ২১।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলেও অভিলাষ করেন না ( তিনিই গুণাতীত পুরুষ )। ২২।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া সুখদুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না, প্রত্যুত গুণ সকল স্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদায়ের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই—এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, ( তিনিই গুণাতীত পুরুষ ) ২৩।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

যিনি সমদুঃখসুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, যিনি আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন ( তিনিই গুণাতীত পুরুষ )। ২৪।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যিনি মান ও অপমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্যরূপই বিবেচনা করিরা থাকেন এবং যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ। ২৫।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। ২৬।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

আমি, নিত্য ও অক্ষয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; আমি শাশ্বত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; এবং আমিই ঐকান্তিক সুখের একমাত্র আস্পদ।

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

# পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, উহার মূল ঊর্দ্ধে, উহার শাখা অধোতে, বেদ সমুদয় উহার পত্র ; যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা। ১।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

ঐ বৃক্ষের শাখা অধ ও ঊর্দ্ধ দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; উহা সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-কর্ম্ম-প্রসূতি মূল সকল অধঃ প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ২।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না, ইহার আদি নাই অন্ত নাই এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থ বৃক্ষ সুদৃঢ় নির্ম্মমত্বরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মূলভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে, উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। ৩। ৪।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে; আমি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হই এই বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহারা অভিমান, মোহ, ও পুত্র কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না;

চন্দ্র সূর্য্য ও হুতাশন যাহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না, তাহাই আমার পরম পদ। ৬।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতি-বিলীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। ৭।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

যেমন, বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে তখন পূর্ব্ব দেহ হইতে ইন্দ্রিয় সমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। ৮।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ রসনা ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দাদি বিষয় সমুদয় উপভোগ করে। ৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

বিমূঢ় ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী দেহাবস্থিত বা বিষয়োপভোগ-লিপ্ত ইন্দ্রিয় যুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মহাত্মারাই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। ১০।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যোগী ব্যক্তিরা যত্নবান্ হইয়া দেহে অবস্থিত জীবকে সন্দর্শন করেন, কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরা যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না। ১১।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। ১২।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি সমুদয়ের পুষ্টিসাধন করিতেছি। ১৩।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করত চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি। ১৪।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে, আমি চারিবেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ১৫।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর ১৬।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

ইহা ভিন্ন অন্য একটী উত্তম পুরুষ আছেন, তাহার নাম পরমাত্মা; সেই অব্যয় পরমাত্মা এই ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। ১৭।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। ১৮।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বপ্রকারে আমাকে আরাধনা করে। ১৯।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

হে অনঘ ভারত! আমি এই পরম গুহ্যশাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়। ২০।

ইতি পুরুষোত্তমযোগোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

---

# ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পর-নিন্দা-বর্জ্জন, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী ( কুকর্ম্ম করিতে লোকলজ্জা ) অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা। হে অর্জ্জুন! যাহারা দৈব সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উক্ত ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১-৩।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

হে পার্থ! যাহারা আসুর সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয়। ৪।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈব সম্পদ্ মোক্ষের ও আসুর সম্পদ্ বন্ধের হেতু; হে পাণ্ডব! তুমি দৈব সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না। ৫।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

হে পার্থ! ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে; দৈব লোকের বিষয় বিস্তারিত রূপে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুরদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৬।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয়; (একারণ) তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, ও সত্য নাই। ৭।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কামজনিত কহে। ৮।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করত মলিন-চিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমুদ্ভূত হয়। ৯।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাহসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচি ব্রত ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন এবং মোহ বশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ (এই মন্ত্রের দ্বারা এই দেবতাকে আরাধনা করিয়া প্রচুর ধনাদি প্রাপ্ত হইব এবম্ভূত দুরাগ্রহ) করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। ১০।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কামোপ-ভোগেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে। শত শত আশা-পাশে বদ্ধ ও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। ১১-১২।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

আজি আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমার এই ধন আছে, পুনরায় এই অর্থ হইবে। আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী। আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত অনেকবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয়। ১৩-১৬।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধন মান মদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ১৭।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার দ্বেষ করে। ১৮।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ, ক্রূরস্বভাব, অশুভকারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। ১৯।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

হে কৌন্তেয়! তাহারা আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার, অতএব এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে। ২১।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২২।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে (কার্য্যে)

প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না। ২৩।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর। ২৪।

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

---

# সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কীদৃশী? সত্ত্ব? কি রজঃ? অথবা তমঃ? ১।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তাহা শ্রবণ কর। ২।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুযায়িনী, পুরুষও শ্রদ্ধাময়, তন্মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেই-রূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। ৩।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রাক্ষসগণের, এবং তামসিকগণ ভূত ও প্রেতসমূহের যাগ করিয়া থাকে। ৪।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬॥

যে সকল হীনচেতা ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বল-সম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লেশিত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অতি ক্রূরস্বভাব বলিয়া জানিবে। ৫-৬।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭॥

সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও তিন প্রকার; তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। ৭।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচি-বর্দ্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর। ৮।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯॥

অতি কটু, অতি অম্ল; অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসগণের অভিলষিত। ৯।

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥

বহুক্ষণের পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট অপবিত্র ভোজ্য তামসিকগিদগের প্রীতিকর। ১০।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক। ১১।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥

ফললাভ বা মহত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। ১২।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

(শাস্ত্রোক্ত) বিধি, অন্নদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধা শূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৩।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপ বলিয়া উক্ত হয়। ১৪।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ। ১৫।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ। ১৬।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ।

ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক। ১৭।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সৎকার, মান, পূজালাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক। ১৮।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

যে তপস্যা দুরাগ্রহ ও আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ (বিনাশার্থ) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক। ১৯।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

কেবল দাতব্যজ্ঞানে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান তাহাই সাত্ত্বিক। ২০।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। ২১।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকারবর্জ্জিত, তিরস্কার-সহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক। ২২।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার, ওঁ, তৎ ও সৎ, পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল। ২৩।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪ ॥

এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ২৪।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল "তত্" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দান ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থ'কেন। ২৫।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গলকর্ম্মে সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২৬।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২৭।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কেননা তৎসমুদয় কি ইহলোকে বা কি পরলোকে কুত্রাপি সফল হয় না। ২৮।

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

# অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। ২।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

কেহ কেহ ( সাংখ্য মনীষীরা ) কহেন, ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অন্যেরা কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কয়েকটী কার্য্য কোন রূপেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ৩।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান! এক্ষণে তুমি প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ তাহা শ্রবণ কর; তামসাদি ভেদে ত্যাগ তিন প্রকার ৪।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। এই কয়েকটী কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। ৫।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

হে পার্থ! আমার নিশ্চয় মত এই যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। ৬।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু মোহবশতঃ যে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ৭।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া কায়ক্লেশ ও ভয় প্রযুক্ত যে কর্ম্ম

পরিত্যাগ করা, তাহা রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে. রাজসত্যাগী পুরুষ ত্যাগলাভে সমর্থ হয় না। ৮।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

হে অর্জ্জুন! আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৯।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিরহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। ১০।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে।১১।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥

কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া থাকে; যাঁহারা ত্যাগী নন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন; কিন্তু সন্ন্যাসীরা উহা লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হন না। ১২।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥

হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত সিদ্ধান্তের অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৩।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৪।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

ন্যায্য বা অন্যায্যই হউক, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, সেই পাঁচটীই তাহার কারণ ১৫।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ কারণ অবধারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধি বশতঃ নিরুপাধি আত্মার কর্তৃত্ব নিরীক্ষণ করে সেই দুর্ম্মতি কখন সাধুদর্শী নয়। ১৬।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি

কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি লোক সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না ও তাঁহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও করিতে হয় না ১৭।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা কর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্পাদনের হেতু। আর কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সাঙ্খ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ কথিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৯।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।২০॥

লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্ন রূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান ২০।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক। ২১।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

কিন্তু যাহা একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ অবাস্তবিক অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান, তাহা তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ২২।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩ ॥

কর্ত্তৃত্বাভিমান-বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্মই সাত্ত্বিক। ২৩।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪ ॥

সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কর্ম্মই রাজসিক। ২৪।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫ ॥

ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।২৫।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬ ॥

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারবিরহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। ২৬।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭॥

অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোকসমন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক। ২৭।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক। ২৮।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯॥

হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আমি উহা সম্যক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ২৯।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা (ধর্ম্মে) প্রবৃত্তি, (অধর্ম্মে) নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায় তাহা সাত্ত্বিকী। ৩০।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী। ৩১।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী। ৩২।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী। ৩৩।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ ফল লাভের অভিসন্ধি করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী। ৩৪।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

হে পার্থ! অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসিক ধৈর্য্য। ৩৫।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩৬।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে ও যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দ্বারা আত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়। ৩৭।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য। পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ। ৩৮।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা তামসিক সুখ। ৩৯।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। ৪০।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

হে পরন্তপ! এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম সমুদয় বিভক্ত হইয়াছে। ৪১।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪২।

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪৩।

কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪ ॥

কৃষি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪৪।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥

মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মনিরত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এক্ষণে স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫।

যতঃ প্রবৃত্তিভূর্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

যাহা হইতে সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যিনি এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৪৬।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বিন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ; কেননা, স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না। ৪৭।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮॥

হে কৌন্তেয়! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে, অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। ৪৮।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯॥

আসক্তিবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিরূপ সত্বশুদ্ধি কর্ম্মনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৯।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০॥

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩॥

মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবে। বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে। এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে,

এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। ৫১। ৫২। ৫৩।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥

তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না, সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ় ভক্তি জন্মে। ৫৪।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ৫৫ ॥

তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক্‌ অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। ৫৫।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সমুদয় অনুষ্ঠান করত আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৬।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর। ৫৭।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে দুস্তর দুঃখ সকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, কিন্তু যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫৮।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত যুদ্ধ করিব না এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিস্ফল হইতেছে, কারণ প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। ৫৯।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥

হে কৌন্তেয়! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়সুলভ শূরতার বশীভূত হইয়া, তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৬০।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥

হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৬২।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩॥

আমি এই পরম গুহ্যজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক্ আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ৬৩।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥৬৪॥

তুমি আমার একান্ত প্রিয়তর এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৪।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫॥

তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। ৬৫।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬॥

তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। ৬৬।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি। ৬৭ ॥

আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, ভক্তিবিহীন ও শুশ্রূষাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে লোক আমার প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না। ৬৭।

য ইদং পরমঃ গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ং ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। ৬৮।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

এই নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম (আর কেহই) হইবে না। ৬৯।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০॥

যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মানুগত সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করা হইবে। ৭০।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥৭১॥

যে মনুষ্য অসূয়াপরবশ না হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। ৭১।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২॥

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ প্রণষ্ট হইল ত?। ৭২।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত হওয়াতে আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি, আমার সকল সন্দেহই দূর হইয়াছে এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ৭৩।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণং॥ ৭৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, ( মহারাজ ! ) আমি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ৭৪।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥

ব্যাসের অনুগ্রহে আমি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন্! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিয়া বারংবার হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইতেছি। ৭৬।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

হে রাজন্! আমি শ্রীহরির সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ পূর্ব্বক বারংবার বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি। ৭৭।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে। ৭৮।

ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

---

গ্রন্থ সমাপ্ত।

# গীতামাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ—

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি সপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তিসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ॥
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬ ॥
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা-নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮ ॥

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশং।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥ ১০ ॥
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেম-ভক্ত্যাদিকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২ ॥
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিস্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।

সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ ॥
শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২ ॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ।
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯ ॥
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।

ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০ ॥
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতোবাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২ ॥
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩ ॥
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬ ॥
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১ ॥
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্শ্বদৈঃ ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পাঠনং পঠনং তথা ।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ ! গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ ॥ ৪৫ ॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
অর্দ্ধামাত্রা হরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭ ॥
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গা-গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ।
ব্রহ্মা বলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ ॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী ।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০ ॥

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয় ॥ ৫২ ॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬ ॥
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥ ৫৭ ॥
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯ ॥
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০ ॥
গীতাধ্যায়সমাযুক্তোমৃতোমানুষতাং ব্রজেৎ।

গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১ ॥
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২ ॥
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩ ॥
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৪ ॥
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতং।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫ ॥
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৬ ॥
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৭ ॥
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮ ॥
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯ ॥
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০ ॥
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।

পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২ ॥
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥

সূত উবাচ।—

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথাপাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং
সমাপ্তম্।

---